মায়ের ভাষায় পড়তে চাই

Introduce Mother Language Education

HTNF, JAC, Kapaeeng & Care-Bangladesh

মায়ের ভাষায় পড়তে চাই

Introduce Mother Language Education

সম্পাদক
জনলাল চাকমা

নির্বাহী সম্পাদক
মথুরা ত্রিপুরা

Hill Tracts NGO Forum (HTNF)
Jum Aesthetics Council (JAC)
Kapaeeng
Care-Bangladesh

মায়ের ভাষায় পড়তে চাই
Introduce Mother Language Education

এইচটিএনএফ, জাক, কাপেং ও কেয়ার-বাংলাদেশ কর্তৃক আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০০৫ উপলক্ষে 'মায়ের ভাষায় পড়তে চাই' শ্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত র‌্যালী ও আলোচনা সভায় প্রবন্ধ ও আলোচকদের বক্তব্য সম্বলিত প্রকাশনা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

ইউএনপিডি'র পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন ফ্যাসিলিটি'র আর্থিক সহায়তায় এ প্রকাশনা প্রকাশিত।

প্রকাশকাল
জুন ২০০৫, রাঙ্গামাটি

প্রাপ্তিস্থান ঃ

হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরাম
রাজবাড়ী রোড, রাঙ্গামাটি-৪৫০০, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, পার্বত্য চট্টগ্রাম
ফোন ঃ +৮৮০-৩৫১-৬২৮৪২, ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-৩৫১-৬১১৯, E-mail: htnf_cht@hotmail.com

জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল
বনরূপা, রাঙ্গামাটি-৪৫০০, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা, পার্বত্য চট্টগ্রাম
ফোন ঃ +৮৮০-৩৫১-৬২৮৪২, E-mail: jac_cht@yahoo.com

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ
৫০.০০ টাকা। US $ 5.00

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

প্রবন্ধ

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষায় আদিবাসী ভাষা প্রয়োগ ও প্রচলন □ জনলাল চাকমা □

আদিবাসীদের ভাষা প্রচলন ও চর্চা □ মৃণাল কান্তি ত্রিপুরা, মং সিং এ্রো ও সুখেশ্বর চাকমা □

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ভাষা সমস্যা □ বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা □

আলোচনা সভা

কীর্তি নিশান চাকমা, উন্নয়নকর্মী □

সুনিল কান্তি দে, সভাপতি, রাঙ্গামাটি প্রেস ক্লাব □

ইউসুফ আলম, সভাপতি, আদি ও স্থায়ী বাঙালী কল্যাণ পরিষদ □

প্রশান্ত ত্রিপুরা,পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক সমন্বয়ক, কেয়ার-বাংলাদেশ □

মঙ্গল কুমার চাকমা, উপদেষ্টা, হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরাম □

সুধাসিন্ধু খীসা, সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ □

রাজা দেবাশীষ রায়, চাকমা সার্কেল চীফ ও চেয়ারপার্সন, হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরাম □

ফটো আর্কাইভ □

আয়োজক সংগঠনের পরিচিতি □

সম্পাদকীয়
মায়ের ভাষায় পড়তে চাই

১৯৯৯ সালে ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আর্ন্তজাতিক ভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করায় একুশে'র তাৎপর্য একদিকে যেমন সারা বিশ্বের সকল মানব জাতির কাছে বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে ভাষা শহীদদের আত্মদানের মর্যাদা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাই যে দিবস এক সময় শুধু বাঙালী জাতির শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হতো তা আজ আর্ন্তজাতিক ভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে, সেজন্য মহান একুশ এখন আর কেবল বাঙালীর নয়, সমগ্র মানব জাতির। পাশাপাশি আাদিবাসী জাতিসমূহের কাছে এই দিবসটি আজ নিজ মাতৃভাষা রক্ষার প্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়ে আসছে।

বাংলা ভাষা একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হওয়ায় বাংলাদেশের আদিবাসীদের বাংলা ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলা ভাষা ব্যবহার ও কথা বলতে হয়। নিজ পরিবারে মাতৃভাষায় কথা বললেও মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের কোন সুযোগ নেই। ফলে উচ্চ শিক্ষিত ও শহুরে আদিবাসী পরিবারের শিশুরা আজ নিজ মাতৃভাষা ভুলতে বসেছে। এমন অবস্থায় আভিজাত্যের অহঙ্কারে অনেক মা-বাবা আবার নিজ সন্তানকে বিজাতীয় ভাষায় কথা বলতে উৎসাহিত করেন। নিজ মাতৃভাষা হারানোর ব্যাথা কখনও অনুভূত হয় না এমন শিক্ষিত সমাজের! তদুপরি নিজ মাতৃভাষা চর্চা ও ব্যহারের কোন তাগিদ না থাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষার মৌলিক শব্দের বদলে বিজাতীয় শব্দ অনুপ্রবেশ ঘটছে অবাধে। এভাবে আজ হারিয়ে যাচ্ছে অনেক জাতির ভাষা। ডানকান ওয়াকার-এর ভাষ্য মতে বর্তমানে বিশ্বে প্রতি মাসে ২টি ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। গার্ডিয়ান পত্রিকার মতে আগামী ১০০ বৎসরের মধ্যে প্রায় ৩০০০ ভাষা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ১০টি ভাষাও এই অবলুপ্তির আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ক গবেষণায় দেখা যায় যে, আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝড়ে পড়ার হার ৬০% থেকে ৭০%, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই হার ৩০% থেকে ৪০%। গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, এই ঝড়ে পড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে ভাষাগত সমস্যা। যেহেতু একদিকে তার শিক্ষা জীবনের প্রথম দিনে যদি স্কুলে এসে শিক্ষকের কোন কথা বুঝতে না পারে, তাহলে সে কিভাবে শিক্ষা শুরু করবে? তার কাছে স্কুলটি যেমন অপরিচিত, ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক অপরিচিত সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় দিনে সে কিভাবে স্কুলে যেতে উৎসাহিত হবে? এমন পরিবিশে একটি শিশুকে ঠেলে দেওয়ার অর্থ হলো স্কুল আর শিক্ষাকে তার কাছে দুর্বোধ্য করে তোলা। অপর দিকে স্কুলে এসে যদি সে নিজ মাতৃভাষা কথা বলতে ও শিক্ষা গ্রহণ শুরু করতে পারে, সে শিক্ষা তার কাছে সহজ

ও বোধগম্য হবে, শিক্ষা গ্রহণে সে উৎসাহিত হবে নিসন্দেহে। স্বভাবতই একটি শিশু নিজ মাতৃভাষায় যত সহজে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে অন্য ভাষায় কখনও পারে না।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের এ গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশে আদিবাসী শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় আদিবাসী ভাষা প্রচলনের অতীব প্রয়োজন। তাই আজ আদিবাসীদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষায় আদিবাসী ভাষা প্রয়োগ ও প্রচলনের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু এবিষয়ে সরকারিভাবে কোন পদক্ষেপ এযাবত গ্রহণ করা হয়নি। যদিও বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৯৯৭ সনের ২রা ডিসেম্বরে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির (খ) অনুচ্ছেদের ৩৩নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান বিষয়টি স্বীকার করে নেয়া হয়েছে এবং চুক্তি মোতাবেক সংশোধিত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তদুপরি আর্ন্তজাতিক শ্রমিক সংস্থা (আইএলও) এর ৪০তম অধিবেশনে কনভেনশন-১০৭-এর ২৩(১) ধারায় আদিবাসী ও উপজাতীয় শিশুদের তাদের নিজস্ব মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের অধিকার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

একথা ঠিক যে, প্রাথমিক শিক্ষায় আদিবাসী ভাষা প্রয়োগ ও প্রচলনের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা রয়েছে। যেমন লিপি সমস্যা, শিক্ষকের সমস্যা, পাঠ্য বইয়ের সমস্যা ইত্যাদি। মূলতঃ এগুলো কিন্তু কোন মৌলিক সমস্যা নয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল সদিচ্ছা ও উদ্যোগহীনতা। সেক্ষেত্রে মূল উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের কার্যকর করতে হবে। এরপর স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানসমুহ যেমন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমুহ আদিবাসী ভাষাসমুহের লিপি সমস্যা সমাধান, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে পারে। এক্ষেত্রে আদিবাসীদের ভাষা ভিত্তিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমুহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এই বাস্তবতার আলোকে বলতে হয় প্রকৃতপক্ষে আদিবাসী সংগঠনসমূহকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষায় আদিবাসী ভাষা প্রয়োগ ও প্রচলন

জনলাল চাকমা

ভূমিকা ঃ

প্রাথমিক শিক্ষায় আদিবাসী ভাষা প্রয়োগ তথা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভের দাবী আজ আদিবাসীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবীতে পরিণত হয়েছে। এই দাবীর আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি"র মাধ্যমে। ইউনেস্কো কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আর্ন্তজাতিক ভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করার ফলে এই দাবী আরো নূতন মাত্রা পেয়েছে। যেহেতু মাতৃভাষায় কথা বলা ও মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে মানুষ মন ও সংস্কৃতির মধ্যে সহজ মিলন ঘটাতে পারে। মাতৃভাষার মাধ্যমে একটি জাতি নিজেদের জীবনকে, কৃষ্টি ও চিন্তাধারাকে প্রসারিত করতে পারে, নিজের সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে পারে।

একটি স্বাধীন জাতির শিশু জন্মের সাথে সাথে এই অধিকার ভোগ করে। কিন্তু এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় ভিন্ন ভাষাভাষি সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জাতিসমূহ যাদের মাতৃভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায় না। তারা রাষ্ট্রীয় ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ ও কথা বলতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশে বাংলা ভাষা একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হওয়ায় এখানে আদিবাসীদের নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের কোন সুযোগ নেই। তাদেরকে বাংলা ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলা ভাষা ব্যবহার ও কথা বলতে হয়। নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের অধিকার ও সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত। তাই আজ আদিবাসীদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষায় আদিবাসী ভাষা প্রয়োগ ও প্রচলনের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে।

মাতৃভাষায় শিক্ষা কেন?

নিউজিল্যান্ড-এর সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, যে সব মাওরি (Maori) শিশু নিজ মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে তারা শুধু ইংরেজীতে শিক্ষা গ্রহণকারী শিশুদের চেয়ে ভাল ফলাফল করেছে। অনুরূপ ফলাফল পাওয়া যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের George Manson University (Virginia)-এর এক গবেষণায়ও। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ইউনিট ১৫টি রাজ্যের ২৩টি স্কুলের (যার ৬টির মধ্যে ৪টি স্কুলে মাতৃভাষায় শিক্ষাক্রম ছিল) ফলাফল ১৯৮৫ সাল হতে পর্যবেক্ষণ করে ১১ বৎসর পর দেখা যায় যে, যে সব ছাত্র-ছাত্রী যত দীর্ঘ সময় ধরে দুটি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করেছিল, তারা মাধ্যমিক স্তরে অপেক্ষাকৃত ভাল ফলাফল করেছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সময়ের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ফলাফলের এক প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে।

ব্রাজিলের টেরেনা জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার অগ্রগতির বিষয়টিও এখানে আরো একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে Sociedade Internacional de Liguaistica (SIL) টেরেনা জনগোষ্ঠীকে মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের এক প্রকল্প গ্রহণ করে যা এক বৎসরের পর বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে পর্তুগীজ হল শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম। এই শিক্ষা ব্যবস্থা কিন্তু টেরেনা জনগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। ১৯৯৮ সালে শিক্ষা বিভাগের এক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা দেখতে পান যে, টেরানা জনগোষ্ঠীর ৭৪% ছাত্র-ছাত্রী পর্তুগীজ ভাষা পড়তে ও লিখতে পারে না এবং ৬ বৎসরের মধ্যে ৫৫% ছাত্র-ছাত্রী ১ম গ্রেড থেকে ২য় গ্রেড উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য পর্তুগীজ ভাষা আয়ত্ব করতে পারেনি। তাদের ঝড়ে পড়ার হার ছিল বেশী। টেরানা জনগোষ্ঠীর এই অবস্থায় এক টেরানা দম্পতি টেরানা শিশুদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের

উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৯৯ সালে শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারীর অনুরোধে নেনসি বাটলার যে প্রথম প্রকল্পে কাজ করেছিলেন তিনিও ঐ দম্পতির সঙ্গে যোগ দিয়ে শিক্ষা দান শুরু করেন একই সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। তারপর জুন মাসে শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী পরিদর্শনে এসে দেখতে পান যে ৭১% ছেলেমেয়ে যারা পর্তুগীজ ভাষায় কিছুই শিখতে পারেনি, তারা টেরানা ভাষায় সহজে পড়তে ও লিখতে শুরু করেছে। এই সাফল্য থেকে বর্তমানে টেরানা অঞ্চলে মাতৃভাষাসহ দ্বিভাষায় শিক্ষা দান অনুমোদিত হয়।

এভাবে বিভিন্ন গবেষণায় এটা প্রমাণিত যে, মানুষ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে অতি সহজে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ শিক্ষাকে সহজ ও বোধগম্য করে, শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষার বিষয়বস্তু সহজে প্রবেশ করে এবং এতে শিক্ষার্থীর সহজাত বুদ্ধি, মৌলিক চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির বিকাশ সহজতর হয়ে থাকে। নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি একজন মানুষকে অনেক বেশী বিশ্লেষণী হয়ে উঠতে সাহায্য করে। অপরপক্ষে ভিন্ন ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ মানুষের জীবনে কোনভাবে পরিপূর্ণতা আনতে পারে না এবং অন্যের ভাষায় জ্ঞানচর্চা কখনও বিশ্লেষণধর্মী হয়ে উঠে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এযাবৎ অনেক গবেষণা ও লেখালেখি হয়েছে। এসব গবেষণায় দেখা যায় যে, আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝড়ে পড়ার হার ৬০% থেকে ৭০%, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই হার ৩০% থেকে ৪০%। গবেষণায় দেখা যায় এই ঝড়ে পড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে ভাষাগত সমস্যা। এক্ষেত্রে নাজিমুদ্দিন শ্যামল-এর উক্তি আরো প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন "যেখানকার উপজাতীয় লোকজন বাংলা ভাষা জানে না, চট্টগ্রামের ভাষা জানে ও বোঝে। কিন্তু শিশু-কিশোররা বস্তুত তাদের মাতৃভাষা অর্থাৎ উপজাতীয় ভাষা ছাড়া কিছুই জানে না। ফলে স্কুলে তারা পাঠ্যপুস্তকে যখন বাংলা বা ইংরেজী পড়তে হয় তখন পাঠ গ্রহণ সত্যিকার অর্থেই দূরূহ হয়ে পড়ে।" জাবারাং-এর গবেষণায় বলা হয় "এভাবে আদিবাসী শিশুরা স্কুলে শুরুতে ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, পরিবেশগত সমস্যার সম্মুখীন হয়। যেমনঃ শিশুরা বাড়ীতে আদিভাষায় কথা বলে। কিন্তু স্কুলে এসেই তাকে ভিন্ন ভাষায় পড়াশোনা করতে হয়, যা শিশুদের জন্য খুবই অসুবিধাজনক। একারণে অনেকে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে ও ঝড়ে পড়ে।" এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় একটি শিশু নিজ মাতৃভাষায় যত সহজে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে অন্য ভাষায় কখনও পারে না। তাই শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে মাতৃভাষাই সবচেয়ে সহজবোধ্য ভাষা।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের এই গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশে আদিবাসী শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় আদিবাসী ভাষা প্রচলনের অতীব প্রয়োজন। এতে আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে ও শিক্ষা গ্রহণ সহজ হবে। কোমলমতি শিশুদের নিজ ভাষায় শিক্ষা শুরু করতে যেমন কোন ভয়ভীতি থাকবে না তেমনি শিক্ষা গ্রহণে আনন্দ উপভোগ করবে। অনেক আদিবাসী পিতা-মাতা নিজ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দানেও সক্ষম হবেন।

আদিবাসী ভাষা প্রচলনের ভিত্তি ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাথমিক স্কুলে আদিবাসী ভাষা প্রচলন মূলতঃ কোন নূতন বিষয় নয়। আদিবাসীদের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ব্রিটিশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যাবস্থা প্রবর্তনের অনেক আগে থেকে চাকমা ও মারমা সমাজে লোকশিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। চাকমা বৈদ্যগণ নিজ শিষ্যদের চাকমা হরফে শিক্ষা দিতেন এবং বৈদ্যশাস্ত্র, পুঁতি, বিজগ (ইতিহাস) সংরক্ষণ করতেন। মারমা সমাজেও কিয়াং কেন্দ্রিক মারমা হরফে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। বর্তমানেও এই লোকশিক্ষা ব্যবস্থা উভয় সমাজে প্রচলিত রয়েছে। পরবর্তীতে ব্রিটিশ আমলে প্রাইমারী স্তরে বাংলা ও ইংরেজী ভাষার পাশাপাশি চাকমা ও মারমা ভাষায় শিক্ষা দান চালু করা হয়। তবে সেই সময়েও এই আদিবাসী ভাষার প্রচলন নিয়ে অধিকাংশ আদিবাসী নেতৃবৃন্দের দ্বিমত ও বিরোধীতা ছিল। ফলে আদিবাসী

ভাষার এই প্রচলন তেমন গুরুত্ব লাভ করেনি। পরবর্তীতে পাকিস্থান আমলে এই ভাষায় শিক্ষা দান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেলে তা চালু রাখার জন্য কোন উদ্যোগ ও দাবী উত্থাপিত হয়নি।

বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে আদিবাসী ভাষা শিক্ষা প্রচলনের আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির মধ্যে ১৯৯৭ সনের ২রা ডিসেম্বরে স্বাক্ষরিত "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি"র ফলে। এই চুক্তির (খ) অনুচ্ছেদের ৩৩নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান বিষয়টি স্বীকার করে নেয়া হয়েছে এবং চুক্তি মোতাবেক সংশোধিত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। তদুপরি আর্ন্তজাতিক শ্রমিক সংস্থা (আইএলও)-এর ৪০তম অধিবেশনে কনভেনশন-১০৭ এর ২৩(১) ধারায় সুপারিশ করা হয়েছে যে, আদিবাসী ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর শিশুদের তাদের নিজস্ব মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদান করার। এই দাবীর আরো বৈধতা এসেছে গত ১৯৯৯ সালে ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আর্ন্তজাতিক ভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করার মাধ্যমে।

এছাড়া এই বিষয়ে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন ফোরামে ও সেমিনারে আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণা চলছে। লক্ষ্যণীয় যে, এসব গবেষণা ও পর্যালোচনায় বিষয়টি দিন দিন গুরুত্ব ও সমর্থন পাচ্ছে। এক্ষেত্রে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জাহিদুল করিমের উক্তি প্রণিধানযোগ্য- The Policy Planners and administrators may consider to make provisions for using the minority tribal language in the administration machinery for the tribal people, side by side with Bengali. However in order to formulate such policies and put them into effect the tribal people must be both consulted and involved at every stage of the development. Nothing can deliver the good without their active participation. A H M Zahidul Karim, 1993, Government needs to reform primary Education Policy for minorities, Dhaka Courier, Vol. 10)

আদিবাসী ভাষা প্রচলনের সমস্যা ও সম্ভাবনা ঃ

উপরের আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাথমিক স্কুলে আদিবাসী ভাষা প্রচলনের কোন আইনগত বাধা নেই। কিন্তু তাই বলে রাতারাতি এই ভাষা প্রয়োগের ব্যাপারে আশান্বিত হওয়ার অবকাশও নেই। আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার আলোকে এই ভাষা প্রয়োগ ও প্রচলনের ক্ষেত্রে কি কি বাধা আসতে পারে তা পর্যালোচনা করা গেল।

(১) আদিবাসী ভাষা প্রচলনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে অনেকে আদিবাসীদের হরফ সমস্যাকে মনে করেন। যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে চাকমা, মারমা ও মুরুং (নূতন আবিস্কৃত) জাতি ছাড়া অন্যদের নিজস্ব কোন হরফ নেই। তদুপরি চাকমাদের প্রচলিত হরফের বিষয়েও মতানৈক্য বিদ্যমান।

(২) দ্বিতীয় সমস্যা হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার জন্য সেই ভাষায় শিক্ষা দান সমস্যাকে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামের ৭ লক্ষের মত আদিবাসীদের ১০টি ভাষা বিদ্যমান। এদের অনেক ভাষার জনসংখ্যা খুবই কম এবং বিক্ষিপ্ত। এই সমস্যা আফ্রিকার দেশসমুহেও আজ দেখা দিয়েছে। আফ্রিকার ৭০০ মিলিয়ন লোক ১০০০ ভাষায় কথা বলেন। কেবলমাত্র নাইজেরিয়াতে ২৫০টি জনগোষ্ঠী ৪০০ ভাষায় কথা বলেন। তাই আদিবাসী ভাষার বিবিধত্ব (Multiplicity of language) কারণে স্কুলে পাঠদান করার মত শিক্ষক পাওয়া যাবে না।

(৩) আদিবাসী ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেকে এসব ভাষার পশ্চাদপদতা, অপূর্ণতা ও স্টান্ডার্ড নয় বলে অনীহা বা বিরোধীতা করতে পারেন। এক্ষেত্রে যুক্তি দেয়া হয়- আদিবাসী ভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা

গ্রহণ সম্ভব নয়, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা গ্রহণ অসম্ভব। মূলতঃ এসব ভাষার ব্যবহার না থাকার কারণে স্বয়ং আদিবাসীদের মধ্যে এরূপ ধারণার উন্মেষ ঘটে। যেমন আজ আফ্রিকার দেশসমূহে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে।

(৪) সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে এর প্রায়োগিকতা নিয়ে দ্বিমত দেখা দিতে পারে। এমনকি অনেকে বিরোধীতাও করতে পারেন। যেমন ছিল ব্রিটিশ আমলে। আজ অফ্রিকার দেশসমূহেও একইভাবে বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়েছে। যেহেতু অনেক পিতামাতা মনে করেন যে, উচ্চশিক্ষা ও চাকুরীর বাজারে এই শিক্ষা কোনভাবে সহায়ক হবে না। এই চিন্তাধারা কিন্তু শুধু পিতা-মাতার নয়, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গড়ে উঠেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার Pietersburge এর Motse High School -এর স্কুল ছাত্রী যেভাবে বলে- 'We don't find our mother tongue to be that important. you don't make overseas calls in your mother tongue; you don't it in everyday life. It's not useful" (Peter Mwaura, Guardian, August 21 2003)। আর এই কারণে আজ আফ্রিকার দেশসমূহে নিজ মৃভাষার চেয়ে ইংরেজীতে শিক্ষা গ্রহণের ঝোঁক বেশী। বলাবাহুল্য আমাদের সমাজেও এইরূপ ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠেছে। আমাদের সমাজের সচ্ছল অভিভাবকরা আজ বিদেশে ইংরেজী মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের পড়ানোর চেষ্টা করছে।

(৫) আবার অনেকে বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষার পাশাপাশি এই ভাষা শিক্ষাকে শিশুদের উপর অতিরিক্ত মানসিক চাপ হিসেবে অভিহিত করতে পারেন।

(৬) এছাড়া আদিবাসী ভাষায় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য বইয়ের সমস্যা, একই স্কুলে একাধিক ভাষা শিক্ষা প্রদানের সমস্যা ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে।

বলাবাহুল্য আদিবাসী ভাষা শিক্ষা প্রচলনের ক্ষেত্রে উল্লেখিত সমস্যাসমূহ অতি সহজে সমাধান করা যায়। যেমন যে সব জাতিসমূহের এখনও কোন হরফ নেই, তাদের মতামত নিয়ে প্রয়োজনে নূতন হরফ আবিষ্কার করা, যেমন মুরং জাতির জন্য "ম্রো চাহ্ চা" নামে নিজস্ব হরফ সৃষ্টি করা হয়েছে। বম জাতির জন্য রোমান হরফে "বম বু বুল বু" শিরোনামে বম ভাষায় প্রাথমিক অক্ষর-জ্ঞান শিক্ষার বই প্রকাশ করা হয়েছে। লিপিবিহীন ভাষার ক্ষেত্রে রোমান হরফে প্রাথমিক পাঠ্য বই প্রকাশের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। আবার বাংলা হরফের মাধ্যমেও এই উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। ইতিমধ্যে বাংলা হরফে বিভিন্ন আদিবাসী ভাষার বই প্রকাশিতও হয়েছে। ত্রিপুরাতে বর্তমানে বাংলা হরফে ককবরক ভাষা চালু করার চেষ্টা করছে ত্রিপুরা সরকার। তবে আদিবাসীদের একটা অংশ রোমান হরফ চালু করার দাবী করছে।

আদিবাসী ভাষা প্রচলনের ক্ষেত্রে উল্লেখিত সমস্যা থাকা সত্বেও বর্তমানে বিশ্বের অনেক দেশে সংখ্যালঘু ও আদিবাসী ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে সেই ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় নাইজেরিয়ায় ২৪টি ও বর্তমান রাশিয়ায় ৪২ আদিবাসী ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু রয়েছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও বেশ কয়েকটি আদিবাসী ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় বাংলা ভাষার পাশাপাশি নেপালী, হিন্দি, উর্দু প্রভৃতি ভাষাভাষী শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। ইদানিং "আলচিকি" নামক বর্ণমালা আবিস্কার করে সাওঁতালী ভাষায় শিক্ষা চালু করা হয়েছে। এছাড়া ত্রিপুরাতেও বাংলা হরফে ত্রিপুরী ভাষা "ককবরক" ভাষায় ১ম ও ২য় শ্রেণীর পাঠ্য বই তৈরী করে শিক্ষা দান করা হচ্ছে। মিজোরামের চাকমা ডিষ্টিক কাউন্সিলে প্রাথমিক স্কুলে চাকমা ভাষায় শিক্ষা দান করা হচ্ছে। এসব উদাহরণ থেকে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, প্রাথমিক স্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা কোন দুরুহ কাজ নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী ভাষার প্রচলনের সুযোগ ও সুবিধা আরো ব্যাপক বলা যায়। যেমন চাকমা ও মারমা ভাষার প্রচলন এখানে যুগ যুগ ধরে চালু রয়েছে। ইদানিং ম্রো ভাষায়ও হরফ আবিস্কার ও পাঠ্য বই লেখা

হয়েছে। অন্ততঃ এই তিন আদিবাসী ভাষা প্রচলনে বর্তমানে কোন সমস্যা নেই। কেবলমাত্র সরকারী অনুমোদন ও উদ্যোগ গ্রহণ করলেই যে কোন মুহুর্তে নিম্ন প্রাইমারী শিক্ষায় এসব ভাষা চালু করা যেতে পারে।

লক্ষ্যণীয় যে, ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী ভাষার প্রচলনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়েছে। বর্তমানে রাঙ্গামাটি পিটিআই প্রশিক্ষণে চাকমা ভাষা কোর্স চালু করা হয়েছে, যাতে অন্য ভাষাভাষী শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে চাকমা ভাষায় কথা বলতে পারেন। বান্দরবান জেলায় রুমা আবাসিক স্কুল, সোয়ালক ম্রো আবাসিক স্কুল, আলীকদম আবাসিক স্কুলে সীমিতভাবে মারমা ভাষা শিখানো হচ্ছে। বেসরকারীভাবেও মাতৃভাষা চর্চার অনেক উদ্যোগ ও প্রয়াস চালানো হচ্ছে যা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ভাষা প্রচলনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বিগত ২ দশক ধরে আদিবাসী লেখক ও শিল্পীগণ নিজ নিজ ভাষার উন্নয়নে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। ফলে রচিত হচ্ছে নূতন নূতন কবিতা, ছড়া, গল্প, গান ও নাটক, সৃষ্টি হচ্ছে নাট্য গোষ্ঠী, সাংস্কৃতিক সংগঠন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ভাষা প্রয়োগ ও প্রচলেনর উপরোক্ত সম্ভাবনা থাকা সত্বেও এই ভাষাগুলির বিলুপ্তির আশঙ্কা বরাবরই থেকে যায়। যেহেতু বর্তমানে সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা ক্রমশঃ বিলুপ্তির পথে এবং ইতিমধ্যে কয়েক শত ভাষা চিরতরে হারিয়ে গেছে। ডানকান ওয়াকার-এর ভাষ্য মতে বর্তমানে বিশ্বে প্রতি মাসে ২টি ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। তার ভাষ্যে আরো জানা যায় অষ্ট্রেলিয়ার অন্যতম আদিবাসী ভাষা “মাতিকে” ভাষায় জানে এমন লোক মাত্র বর্তমানে ৩ জন বেচেঁ আছে। গার্ডিয়ান পত্রিকার মতে আগামী ১০০ বৎসরের মধ্যে প্রায় ৩০০০ ভাষা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “সামার ইনষ্টিটিউট অব লিঙ্গুইস্টিকস” এর সমীক্ষায় প্রকাশ, “৫১টি ভাষা আছে যার লোকসংখ্যা মাত্র ১ জন জীবিত, আর ১০০ জনের কম জানে এমন ভাষা আছে প্রায় ৫০০। ১০০০ জন বলতে পারে এমন ভাষা আছে ১৫০০, ১০০০০ এর কম সংখ্যক মানুষ বলতে পারে এমন ভাষার সংখ্যা ৩০০০। আর ১০০০০০ লোকের ভাষা হিসাবে আছে ৫০০০। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ১০টি ভাষার মধ্যে ৭টি ভাষা শেষোক্ত গ্রুপের পর্যায়ভূক্ত এতে কোন সন্দেহ নেই। আগামী ৫০ বৎসরে হয়ত আমরা এদের যে কোন ভাষার অবলুপ্তির প্রত্যক্ষদর্শী হতে পারি।

যে সব উদ্যোগ নিতে হবে ঃ

প্রাথমিক শিক্ষায় আদিবাসী ভাষা প্রয়োগ ও প্রচলনের ক্ষেত্রে মূলতঃ মূল উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে। প্রথমে প্রজ্ঞাপন জারী করে ভাষা শিক্ষার চালু করার আইনের কার্যকারিতার ভিত্তি রচনা করতে হবে। এরপর পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ আদিবাসী ভাষাসমুহের লিপি সমস্যা সমাধান, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে পারে। এক্ষেত্রে আদিবাসীদের ভাষা ভিত্তিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। মূলতঃ এই সমস্যাটি কোন জটিল সমস্যা নয়। আদিবাসী ভাষা প্রয়োগ ও প্রচলনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল সদিচ্ছার অভাব এবং উদ্যোগহীনতা। এই বাস্তবতার আলোকে বলতে হয় এক্ষেত্রে আদিবাসী সংগঠনসমূহকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

বলাবাহুল্য সরকারী উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্র তৈরী করতে আদিবাসী সচেতন জনগোষ্ঠী বা সংগঠনসমূহকে যে সব গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে হবে, তা হল-

প্রথমতঃ আদিবাসী সমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা যেন স্বীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিজ মাতৃভাষা প্রচলনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে। যেহেতু ভাষা ও সংস্কৃতি খুবই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটি জাতির ভাষা হারিয়ে যাওয়া মানে সেই জাতির সংস্কৃতিও লুপ্ত হওয়া।

দ্বিতীয়তঃ নিজ জাতীয় অক্ষরে বয়স্ক স্বাক্ষরতা অভিযান পরিচালনা করা যেন ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও প্রাত্যহিক হিসাব-নিকাশ করা যায়। এতে নিজ ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাবে ও ভাষার প্রচলন বৃদ্ধি পাবে। নিজ ভাষায় গল্প, কবিতা, সাহিত্য ও সংবাদপত্র প্রকাশ করা যেন ভাষা চর্চার বৃদ্ধি ঘটে।

যে জাতি জাতীয় ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুরূপ পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে সেই জাতির ভাষা ব্যবহার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে আর কোন বাহ্যিক শক্তির প্রয়োজন হবে না। প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনে সকলে যেমন নিজ ভাষা শিখে নেবে, তেমনি সেই জাতির শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস জানার জন্য অন্যরা সেই ভাষা জানতে আগ্রহী হবে। এ অবস্থায় যে ভাষা পৌঁছতে পারবে সেই ভাষার বিলুপ্তি ঘটার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। তাই স্বীয় ভাষাকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যেমন নিজকে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে, তেমনি সরকারী স্বীকৃতি আদায়ের জন্য ভাষাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রয়োগের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

==================

সহায়ক তথ্যসূত্র ঃ-

১। বিবিসি নিউজ, দৈনিক পূর্বকোণ, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ ইং

২। বাংলাদেশে উপজাতিদের শিক্ষা সংকট ও উত্তরনের সম্ভাবনা, পরিপ্রেক্ষিত পার্বত চট্টগ্রাম-পৃষ্টা-১১৬

৩। প্রাথমিক শিক্ষা চিত্রঃ বাংরাদেশের আদিবাসী, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ও জাবারাং কল্যাণ সমিতি, মার্চ ২০০৪।

মৃণাল কান্তি ত্রিপুরা, মং সিং এ্ঞো ও সুখেশ্বর চাকমা

ভূমিকা ঃ

একটি রূপক গল্প দিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করা যাক। 'বলিরাম' আদিবাসী ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর একজন ছাত্র। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। তার মা-বাবা জুম চাষের শত ব্যস্ততার মাঝেও সন্তানকে আগ্রহ দেয়, অনুপ্রেরণা জোগায়। লেখাপড়া শিখিয়ে অনেক বড় হবার স্বপ্ন দেখায়। সেও পরম আগ্রহে বইখাতা নিয়ে স্কুলে যেত। যদিও ক্লাসের পড়াগুলো বুঝতে ভারি কষ্ট হয় তার, বলা যায় অধিকাংশই সে বোঝে না। তবুও সীমাহীন আগ্রহ নিয়ে তোতা পাখীর মত সে পড়ে যায় স্কুলের পড়া। তারপরও একদিন বিপত্তি ঘটল। স্কুলে যে শিক্ষক পড়া নিচ্ছিলেন তিনি কোন বাঙ্গালী শিক্ষক নন, আদিবাসী জনগোষ্ঠীরই একজন শিক্ষক। বলিরামকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'বলতো আমাদের মাতৃভাষার নাম কি?' বলিরাম অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর উত্তর দিল 'আমাদের মাতৃভাষার নাম ককবরক্।' তার উত্তর শুনে আদিবাসী শিক্ষকের সন্তুষ্ট হবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। তার মনে পড়ল ছোটবেলায় তিনিও একই প্রশ্নের উত্তর দিতে একই ভুল করেছিলেন। শাস্তি পেয়ে নিজের উত্তর শুধরে নিয়েছিলেন। তার ছাত্রও লেখাপড়ার প্রতি অবহেলার কারণে এ রকম সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে আর কোনদিন ভুল না করে তার জন্য উত্তর শুধরে দিলেন বেত দিয়ে পিটিয়ে, কঠোর শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে। বলিরাম-অশ্রুসিক্ত চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তার শিক্ষকের দিকে। কক্‌বরক্‌ই তো ত্রিপুরাদের মাতৃভাষা, সেতো সঠিক উত্তরই দিয়েছে। তারপরও তাকে কেন শাস্তি পেতে হলো? তবে কি তার মাতৃভাষা কক্‌বরক্ নয়? এ রকম হাজারো প্রশ্ন তার মনে এসে ভীড় জমাতে লাগল। কিন্তু সে কোন সদুত্তরই পেলনা। এত সহজ একটা প্রশ্নের উত্তর যে এত কঠিন হবে, বলিরাম কি সে দিন বুঝতে পেরেছিল? বলাবাহুল্য, তার শিক্ষকের শুধরে দেয়া উত্তর হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে বলিরাম স্কুল থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভাষাভাষী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ শিশুকেই এভাবে স্কুল থেকে পালিয়ে বাঁচতে হয়। বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলাম মূলতঃ বাংলাভাষী শিশুদের জন্য রচিত এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিষয়বস্তু মুসলিম সাম্প্রদায়িক পরিমন্ডল নিয়ে বিরচিত হওয়ায় বাঙ্গালী মুসলমান শিশুদের জন্যই তা উপযোগী। তারপরও বিভিন্ন জরিপ ও পরিসংখ্যান রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ১ম শ্রেণী থেকেই শতকরা অন্ততঃ ৩০ জন শিশু স্কুল ত্যাগ করে। এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, পাঠের বিষয়বস্তু ও পাঠদান পদ্ধতি শিশুর মনকে আকৃষ্ট করতে পারছে না। সুতরাং মাতৃভাষা বাদ দিয়ে সংস্কৃতি বিবর্জিত শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে পর্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী শিশুদের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়। এ কারণবশতঃ বিশ্বের মৃতপ্রায় অন্যান্য ভাষার মতোই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহের ভাষাও বিপন্ন হয়ে পড়ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষায় ভাষাগত সমস্যার কারণে শিক্ষার ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে। যার আনিবার্য ফলাফল হিসেবে প্রভাব পড়ছে আদিবাসী সংস্কৃতির উপর। কেননা শিক্ষাই হল সংস্কৃতির আদি উৎসভূমি। মাতৃভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা হলে শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষার বিষয়বস্তু আরো সহজ ও বোধগম্য হত। এই কারণে আদিবাসীদের শিক্ষা জীবনে মাতৃভাষার প্রচলন ও চর্চা অত্যাধিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে।

মানুষের ভাষা-সংস্কৃতি: জন্ম ও বিকাশ ঃ

বেঁচে থাকার সংগ্রামে ক্রমান্বয়ে মানুষ সংস্কৃতি নির্ভর হয়ে পড়েছে। সংস্কৃতি শব্দের অন্যতম অর্থই হল বেঁচে থাকার রীতিনীতি যার মাধ্যমে মানুষ বেঁচে থাকার পথগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে। সংস্কৃতির এই রীতিনীতি দ্রুত পরিবর্তনশীল। এমনও দেখা যায় যে, একজনের জীবন কালেই সংস্কৃতির ধারা দ্রুতলয়ে পরিবর্তিত হচ্ছে অথচ জৈবিক অভিযোজনের জন্য প্রয়োজন অনেক পুরুষের সময়কাল। পরিবর্তিত জীবনধারার সঙ্গে সমতালে এগিয়ে যাবার চেষ্টায় মানুষ তাই সংস্কৃতির অনুশীলনকেই প্রধান উপচার হিসেবে গ্রহণ করেছিল। জৈবিক

অভিযোজনকে নয়। যেহেতু সাংস্কৃতিক রীতিনীতিগুলো মানুষকে শিখে নিতে হয় সেহেতু জৈবিক উত্তরাধিকারের মাধ্যমে মানুষ তা আয়ত্ব করে না। এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে বা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে এর প্রচলনের জন্য একটা নির্দিষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থিরীকৃত করার প্রয়োজন দেখা যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে বোঝানো হচ্ছে, কিভাবে এক ধরনের রীতিনীতি বা আচার ব্যবহারের সাথে পরস্পরকে পরিচিত করে তোলা যায়, কি করে নিজস্ব ধ্যান ধারণার সাথে অন্যকে পরিচিত করে তোলা যায় এবং কি করেই বা অন্যের ধ্যান ধারণা ও চিন্তা জগতের সঙ্গে নিজে পরিচিত হতে পারে। কতগুলো নির্ধারিত সংকেত বা ইঙ্গিতের সাহায্যে জীবজগতে একে অন্যের ভাবধারার সাথে পরিচিত হয়। এই সংকেত যা শব্দগত বা শুধু ইঙ্গিত বা ইশারায় হতে পারে। এক্ষেত্রে মানুষ তার ভাষার সাহায্য জটিলতম চিন্তাধারা প্রকাশে যেমন সক্ষম হয় ও প্রয়োজনে পুনঃপুনঃ সে একই অভিব্যক্তি ক্রমান্বয়ে প্রকাশ এবং অনবরত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এনে নতুন করে প্রকাশ করতে পারে।

মানুষের ভাষা, যা তার যোগাযোগ পদ্ধতির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান, তার তিনটি মৌলিক ও স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রথমতঃ মানুষের ভাষা সীমিত সংখ্যক ধ্বনির মাধ্যমে হাজারো রকমের বস্তু ও অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে সমর্থ। পৃথিবীতে খুব কম ভাষাই রয়েছে যেখানে সর্বমোট ব্যবহৃত ধ্বনির সংখ্যা পঞ্চাশের উপরে। অথচ মাত্র কয়েকটি ধ্বনিকে বিভিন্নভাবে একত্রিত করে হাজারো রকমের বস্তু ও অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ প্রকাশ করে চলেছে। বিভিন্ন ধ্বনির যথারীতি একত্রীকরণের মাধ্যমে যেভাবে আমরা বিভিন্ন মানুষ একই বস্তু বা অভিজ্ঞতাকে বা অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারি তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। যেমনঃ-

ত নাং কি? (চাকমা), নাক্ নামে জালে? (মারমা), নিনি বুমং তামা (ত্রিপুরা)- প্রভৃতির অর্থ হল বাংলা- তোমার নাম কি? এর অতিরিক্ত কোন কিছুই নয়। শব্দ যেন বস্তুর প্রতীক, কিন্তু প্রতীক শব্দ যেন ঐ বস্তুর রূপ নয়। এই যে শব্দকে প্রতীক থেকে স্বতন্ত্র্য করা তা শুধুমাত্র মানুষের ভাষাতেই সম্ভব।

মানুষের ভাষার এই বিশেষ ক্ষমতাই মানুষের ভাষাকে অসীম শক্তির অধিকারী করে তুলেছে। বিভিন্ন ধ্বনিকে যুক্ত করে অনবরতই আমরা নিত্য নতুন শব্দ তৈরি করে চলেছি। নিত্য নতুন প্রতীকের জন্ম দিচ্ছি আর প্রত্যেকটি প্রতীককে অর্থময় করে তুলছি।

দ্বিতীয়তঃ মানুষের ভাষা যে শুধু কর্মক্ষম তাই নয়। এর জন্ম ক্ষমতা প্রায় সীমাহীন। শব্দ ও ধ্বনিকে একত্র করে নতুন অর্থময় শব্দে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে মানুষকে বিশেষ বেগ পেতে হয় না, যদিও পূর্বে সেই শব্দ ও ধ্বনি সে কোনদিন শোনেনি। যে কোন ভাষাভাষী লোক এমনিভাবে তাদের ভাষায় অসংখ্য বাক্য অনবরত তৈরি করে যেতে পারে। মানুষের ভাষার এ জন্ম ক্ষমতা ভাষাকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে এক নমনীয় যন্ত্রে পরিণত করেছে, যে যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই আমরা নিত্য নতুন সংবাদের আদান প্রদান করতে সমর্থ হই।

তৃতীয়তঃ মানুষের ভাষা নিজস্ব পরিবেশের বাইরের সংবাদকে প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে। অতীতে যা একদিন ঘটেছিল, আমরা তা যেমন করে প্রকাশ করতে পারি ভবিষ্যতে যা ঘটতে পারে বা ঘটাব সম্ভাবনা আছে বা যা কল্পনামূলক বা যা হয়তো নাও ঘটতে পারে তেমন ঘটনাও আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি। মানুষের ভাষার এই স্থান পরিবর্তন (Displacement) ক্ষমতার বলেই আমরা বস্তুনিরপেক্ষ বিমূর্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে পারি, অন্যান্য প্রাণী যা পারে না।

মানুষের ভাষার এই তিন বিশেষত্ব যাকে আমরা বলতে পারি প্রচলিত রীতি বা অনুশীলন ক্ষমতা (Conventionality) জন্ম ক্ষমতা (Productivity) ও স্থান পরিবর্তন ক্ষমতা (Displacement)-যা মানুষকে নিত্য নতুন পরিকল্পনা করতে শেখায়, ভালো-মন্দ নির্ধারণ করতে শেখায় আর সর্বোপরি মানুষকে দেয় সমন্বয় সাধন করার এক ক্ষমতা যা দিয়ে সে নিজেকে একটি স্থির নির্ধারিত পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে কিংবা

প্রয়োজনে নতুন পথের যাত্রী হয়ে যেতে পারে। আর মানুষের এ ভাষাই মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর উর্ধে স্থান দিয়েছে।

জীবনের অভিজ্ঞতাকে ভাষায় অনুবাদ করে বা রূপ দিয়ে মানুষ জ্ঞানের এক ভান্ডার তৈরি করে যা পরবর্তী কালের মানুষের জন্য রেখে দিতে পারে। মানুষের এই শক্তি যা দিয়ে আমরা সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে পরবর্তী কালের মানুষের জন্য রেখে যেতে পারি। তাই মানুষের সংস্কৃতি বিকাশের বিশেষ অবলম্বন ও বৈশিষ্ট্য।

প্রতিটি ভাষাই কতগুলো নির্দিষ্ট ধ্বনির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে, এই ধ্বনির সংখ্যা প্রত্যেক ভাষাতেই সীমিত এবং এই ধ্বনির পূর্বে নির্ধারিত রীতি অনুসারে ও সমন্বয়ে শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য গড়ে ওঠে। প্রত্যেক ভাষাই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ঐ ভাষাভাষীদের প্রাকৃতিক ও সামাজিক অর্থাৎ সামগ্রিক পরিবেশকে প্রকাশের যোগ্যতা রাখে। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপখাইয়ে সেই পরিবর্তিত পরিবেশকে প্রকাশ করার জন্য প্রত্যেক ভাষাই অনবরত নিত্য নতুন শব্দ আবিষ্কার ও একত্রীকরণের যোগ্যতা রাখে। যে কোন পরিবেশের বর্ণনার জন্য এবং পরিবেশের রূপ বা শ্রেণী নির্ধারণের জন্যে যে শব্দাবলীর প্রয়োজন, তা প্রত্যেক ভাষায় প্রয়োজনানুযায়ী রয়েছে। বস্তুনিরপেক্ষ চিন্তা করার ক্ষমতা প্রত্যেক ভাষাতেই বিদ্যমান। কোন ভাষাই শুধুমাত্র ব্যক্তি বিশেষ বা বস্তু বিশেষের প্রকাশের বাহন রূপে সীমাবদ্ধ নয় এবং এদিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় কোন ভাষাই তুলনামূলকভাবে অন্য ভাষা থেকে নিকৃষ্ট বা অনুন্নত নয়, প্রত্যেক ভাষায়ই সেই ভাষাভাষীদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠী ঃ

আদিবাসীরা হচ্ছে অনেক দেশেরই প্রথম বসতি স্থাপনকারী বা মূল অধিবাসী । পৃথিবীর ৫টি মহাদেশের ৭০টি দেশে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ একাংশ- প্রায় ১৫০ মিলিয়ন আদিবাসী বসবাস করে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে। যেমন- বাংলাদেশ, মায়ানমার, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, শ্রীলংকা এবং থাইল্যান্ড। প্রায় ৩০ মিলিয়ন আদিবাসী বাস করে ল্যাটিন আমেরিকায়। বলিভিয়া, গুয়াতেমালা ও পেরুর মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী হচ্ছে আদিবাসী জনগণ। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার বিস্তৃতির সময় অনেক আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করা হয়েছে এবং তাদের ভূমি বেদখল করা হয় জোর করে।

আদিবাসীদের রয়েছে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, ভূমিসংলগ্ন জীবন-জীবিকা, ধর্ম এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাঠামো। কিছু কিছু ধারণ করে ঐতিহ্যগত জীবন পদ্ধতি। তারা মূলত নিজেদের মৌলিক পরিচিতিটাকে বজায় রাখতে চায়। কিন্তু নিজেদের স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও আদিবাসীরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ। অনেক ক্ষেত্রেই তারা বৈষম্য, দারিদ্র, স্বাস্থ্যহীনতা, বেকারত্ব প্রভৃতির শিকার। তাদের ভূমি ও সম্পদ- বনায়ন, খনি, বাঁধ, সড়ক নির্মাণ, রাসায়নিক বর্জ্য নিষ্কাশন, পারমানবিক পরীক্ষা, সেচ প্রকল্প প্রভৃতি ক্ষতিকারক উন্নয়ন কাজের কারণে আজ হুমকির সম্মুখীন।

সারাবিশ্ব জুড়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহ ভূমি ও জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং তাদের অধিকারের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আদিবাসীদের এই সংগ্রাম আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ১৯৮২ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় একটি Working Group on Indigenous population (WGIP)। নমনীয়তা ও উন্মুক্তকরণের স্বার্থে জাতিসংঘ আদিবাসীর কোন ধরাবাধা সংজ্ঞা নিরূপণ করেনি। তবে

দিক নির্দেশনা হিসেবে Jose martinez Cobo-র তৈরি সংজ্ঞাটি WGIP ব্যবহার করে। Martinez Cobo-র মতে আদিবাসী জনগোষ্ঠী হলঃ

(১) যাদের প্রাক-আগ্রাসন ও প্রাক-ঔপনিবেশিক আমল থেকেই নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় বসবাসের একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রয়েছে।

(২) ঐ ভৌগোলিক সীমারেখার অভ্যন্তরে ক্ষমতাশালী অন্য অংশের তুলনায় স্বতন্ত্র (distinct) বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন।

(৩) সমাজের আধিপত্যহীন অংশ।

(৪) তাদের সাংস্কৃতিক বিন্যাস, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী, তাদের ভৌগোলিক সীমারেখায় জনগোষ্ঠী হিসেবে ধারাবাহিক অস্তিত্ব সংরক্ষণ করতে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের হাতে হস্তান্তর করতে দৃঢ় সংকল্প।

Jose martinez Cobo-র সংজ্ঞা অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, লুসাই, পাংখোয়া, চাক ও খেয়াং-এই ১১টি জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী (Indigenous) জনগোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করা যায়। কিন্তু বাংলাদেশে সাংবিধানিক বা সরকারীভাবে আদিবাসীদের অস্তিত্ব ও অধিকার স্বীকৃত নয়। ব্রিটিশ শাসনামলে প্রণীত ১৯০০ সালের শাসনবিধিতে এদেরকে Indigenous Hillman বা আদিবাসী পাহাড়ী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনে 'আদিবাসী' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ১৯৯৫ সালের ১২ নম্বর আইনেও একই স্বীকৃতি মেলে। এছাড়া বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সংগঠনের মুখপত্র 'সংহতি'-র বিভিন্ন সংখ্যায় 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বাণীগুলোতে বাংলাদেশে 'আদিবাসী' জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রয়েছে বলে স্বীকৃত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ভাষা ও বর্ণমালা ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের ভাষা প্রচলন ও চর্চা নিয়ে এ আলোচনায় ভাষা ও বর্ণমালার অবতাড়না অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মূলতঃ এখানকার আদিবাসীদের চেহারা, সামাজিক আচার আচরণ, রীতিনীতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, মানবিক গড়ন প্রভৃতি মিল থাকলেও তাদের ভাষা এক নয়। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা আদিবাসীরা মঙ্গোলীয় হলেও তাদের ভাষা ইন্দো-এরিয়ান পরিবারভূক্ত। পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের মধ্যে খিয়াং জনগোষ্ঠী ছাড়া সবাই তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্ণমালা ব্যবহার করে থাকে। চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা একই ধরনের বর্ণমালা ব্যবহার করে থাকে যা 'চাকমা' বর্ণমালা হিসাবে পরিচিত। মারমা ও চাক'রা একই ধরনের বর্ণমালা ব্যবহার করে থাকে যা 'মারমা' বর্ণমালা হিসেবে পরিচিত। বম, লুসাই, ও পাংখোয়ারা রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করে থাকে। ম্রো জনগোষ্ঠী 'ম্রো চাহ্ চা' নামে একটি বর্ণমালা ব্যবহার করে। আবার যারা খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী তারা ব্যবহার করেন রোমান বর্ণমালা। পার্বত্য চট্টগ্রামে খুমিরা ম্রো বর্ণমালা ব্যবহার করে থাকে তবে মায়ানমারে রোমান বর্ণমালা থেকে বর্ণ নিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে জানা যায়। ত্রিপুরা বৈদ্যদের মধ্যে কিছু কিছু চাকমা ও মারমা বর্ণমালা ব্যবহার করতে দেখা যায়। তবে বাংলা ও রোমান বর্ণমালা থেকে বর্ণ নিয়ে পৃথক দুটি বর্ণমালা রয়েছে।

ভাষা পরিবার		ভাষা
অ) ইন্দো- এরিয়ান দল		১) চাকমা ২) তঞ্চঙ্গ্যা
আ) টিবেটো-	ক) বার্মা- আরাকান উপদল	১) মারমা

বার্মান দল	খ) ককবরক উপদল	১) ত্রিপুরা
	গ) কুকি- চিন উপদল	১) লুসাই ২) পাংখোয়া ৩) বম ৪) খিয়াং ৫) খুমী ৬) ম্রো ৭) চাক

সূত্র ঃ Sugata Chakma: The Tribal Language of CHT ও সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি শিক্ষা।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও আদিবাসীদের প্রত্যাশা ঃ

২১শে ফেব্রুয়ারীকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণার মাধ্যমে সালাম, রবকত, রফিক, জব্বারের রক্তে রাঙানো অমর একুশে বিশ্ব ইতিহাসের পরিমন্ডলে এক নতুন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। নতুন সহস্রাব্দ থেকে উনিশশ বায়ান্নের মহান ভাষা অন্দোলন বিশ্ববাসীর মাতৃভাষা প্রীতি ও অন্তরঙ্গ চেতনায় এক নতুন ব্যঞ্জনা ও মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। গত ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ প্যারিসে ইউনেস্কো সদর দপ্তরে সংস্থার ৩০তম সাধারণ অধিবেশনে উত্থাপিত প্রস্তাবে বলা হয় "১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশে মাতৃভাষার জন্য অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ এবং সেদিন যারা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে দিনটিকে 'আন্ত র্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণার প্রস্তাব করা হচ্ছে।' প্রস্তাবটি উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই তা উপস্থিত সকল সদস্যের সর্বসম্মতিক্রমে সাদরে গৃহীত হয়। ইউনেস্কোর এ সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার জন্য আত্মত্যাগের সংগ্রাম যেমন বিশ্ব-স্বীকৃতি পেয়েছে, তেমনি বাঙ্গালি জাতিসত্ত্বার গন্ডিকে অতিক্রম করে মহান একুশে ফেব্রুয়ারী বিশ্বের প্রতিটি ভাষাভাষী বা জাতিসত্ত্বার সম্পদে পরিণত হয়েছে। ইউনেস্কো 'অমর একুশ'-কে বিশ্ব-স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে প্রতিটি জাতিসত্ত্বার মাতৃভাষার প্রতি পরম মর্যাদা প্রকাশ করছে। ইউনেস্কো মনে করে মাতৃভাষা প্রসারের লক্ষ্যে পরিচালিত বিভিন্ন কর্মকান্ড ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং বহু ভাষাভিত্তিক শিক্ষা প্রক্রিয়ার ধারণা সমুন্নত করতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। সেই সঙ্গে এ ধরনের কর্মকান্ড বিশ্বব্যাপী ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সর্ম্পকে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি সহিষ্ণু ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সংহতি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।"

একুশে ফেব্রুয়ারী ইউনেস্কো কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রকারান্তরে গোটা বিশ্বের সকল মাতৃভাষারই স্বীকৃতি। এই দিবস হয়ে উঠুক সারা বিশ্বে একচেটিয়া ভাষা-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আড়ালে জাতিগত শোষণ ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে শোষিত জাতি ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাসমূহের সম্মিলিত প্রতিরোধ দিবস। বাংলা ভাষা আজ আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত কিন্তু এই দিবসের সার্থকতা তখনই আসবে যখন বাংলাদেশের অনগ্রসর আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং তাদের ভাষা সংস্কৃতিকে যথার্থ স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। কেননা মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান ও চিন্তন বিন্যাসের অভাবে সমাজে মৌলিক চিন্তা ও সৃজনশীলতার স্রোত সৃষ্টি হতে পারে না। ভাষাগত পরাধীনতা মানুষের মৌলিক চিন্তাকে বিকশিত হতে দেয় না। তাই মনের মুক্তি, চিন্তার স্বাধীনতা, মৌলিক অনুসন্ধিৎসার উপলব্ধি ও সৃজনশীলতা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার কোন বিকল্প হতে পারে না। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর পরিচয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদান হল তার মাতৃভাষা। বাংলাদেশে প্রচলিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় একক ভাষা-সংস্কৃতির পাশাপাশি আদিবাসীদের বহু ভাষা-সংস্কৃতির ভাবধারার সূচনা হোক, এটাই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আদিবাসীদের প্রত্যাশা।

আদিবাসীদের ভাষাগত অধিকার ও আইনগত ভিত্তি ঃ

ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারীকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে ঘোষণার আগেও আদিবাসীদের মাতৃভাষার অধিকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদগুলোতে স্বীকৃত হয়েছিল। ১৯৫৭ সালে ৫ই জুন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ৪০তম অধিবেশনে ১০৭নং কনভেনশনে আদিবাসী ও উপজাতি ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে কিছু নীতিমালা তৈরি করে। উক্ত কনভেশন-এর ২৩(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদেরকে তাদের মাতৃভাষায় পড়তে ও লিখতে শিক্ষা দান করতে হবে, কিংবা যেখানে এটা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে তাদের সমগোত্রীয়দের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দান করতে হবে।’ আবার ২৩ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘মাতৃভাষা বা আদিবাসী ভাষা থেকে জাতীয় ভাষা কিংবা দেশের একটি অফিসিয়াল ভাষায় ক্রমান্বয়ে উত্তরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।’

১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি’-র ‘খ’ খন্ডের ৩৩নং ধারার (খ)-এ বলা হয়েছে, ‘পরিষদের (পার্বত্য জেলা পরিষদ) কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হবেঃ ১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা ২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ও ৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।’ চুক্তি অনুযায়ী ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ সংশোধনী বিলের মাধ্যমে বিষয়সমূহ আইনে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। রাঙ্গামাটি/ খাগড়াছড়ি/ বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ৩৬(ঠ) ধারায় ‘মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা’কে আইনগত স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার স্বাক্ষরিত ‘আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ’এর ৩০নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে, ‘যেসব দেশে জাতিগোষ্ঠীগত, ধর্মীয় কিংবা ভাষাগত সংখ্যালঘু কিংবা আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে, সেসব দেশে ঐ ধরনের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভূক্ত বা আদিবাসী শিশুকে সমাজে তার নিজস্ব সংস্কৃতি ধারণ, নিজস্ব ধর্মের কথা ব্যক্ত করা ও চর্চা করা, তার সম্প্রদায়ের অপরাপর সদস্যদের সাথে ভাষা ব্যবহার করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।’

১৯৬৬ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত International Covenant on Civil and Political Rights-এর ২৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, “যেসব রাষ্ট্রে নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয় বা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু বাস করেন, সেখানে ঐসব সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির মানুষেরা ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীগতভাবে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজেদের ধর্ম অনুসরন করা ও প্রচারের অধিকার নিরংকুশভাবে ভোগ করবে।’

এ সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক চুক্তি, সনদ প্রভৃতির আলোকে এখন প্রয়োজন হচ্ছে, আদিবাসীদের মাতৃভাষা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচলন ও চর্চা করার ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়া।

আদিবাসীদের মাতৃভাষা প্রচলন ও চর্চা: সংকট ও সম্ভাবনা ঃ

যুগে যুগে ভাষাগত বৈরীতা ও জাতিগত বৈরীতা মানব ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। অনেক উন্নত ও স্বাধীন দেশেও ভাষার সংঘাত রয়েছে। যেমন- কানাডায় ইংরেজী ও ফরাসীর দ্বন্দ্ব। পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে অসহিষ্ণুতা ও বৈরীতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভাষা বৈরীতার পাশাপাশি জাতিগত বৈরীতাও দেখা যায়। যার কারণে সংখ্যাগুরু ভাষাভিত্তিক জনগোষ্ঠীর চাপে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীরা নিজেদের বড় বিপন্ন মনে করছে বর্তমানে। রাষ্ট্রে ত্রুটিপূর্ণ ভাষা পরিকল্পনা নীতি অনেক সময় সুফল বয়ে আনে না। একটি ভাষাকে আইনের জোরে অন্য ভাষাগুলির উপর চাপিয়ে দিতে গিয়ে নাজেহাল হতে হয়েছে বহু সংস্কৃতিকে। ভাষাগত দ্বন্দ্ব সংঘাত অনেক সময় জটিল করে তোলে জাতিগত দ্বন্দ্ব সংঘাতকে। যার বড় প্রমাণ হল খোদ ১৯৫২ সারের বাংলা ভাষার আন্দোলন।

স্বাধীন বাংলাদেশে যে সকল ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা বলা যায় না। স্বাধীন বাংলাদেশে যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয় সেই সংবিধানে আদিবাসীদের জাতীয় অস্তিত্ব স্বীকৃতি পায়নি। সংবিধানে ৬নং অনুচ্ছেদে

লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল- "বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত হইবেন।" উক্ত অনুচ্ছেদের মাধ্যমে কেবল আদিবাসীদের জাতিগত পরিচয়ের অধিকারই বঞ্চিত হয়নি, আদিবাসী জাতিসমূহকে বাঙ্গালী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যার কারণে বলা যায়, বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই আদিবাসীদের জাতিগত বিকাশের জন্য তাদের ভাষা প্রচলন ও চর্চার ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্রীয় সংকট তৈরি হয়েছে। পরবর্তীকালে জেনারেল জিয়ার আমলে সংবিধান সংশোধন করে বাংলাদেশের নাগরিকদের 'বাঙ্গালী'-র পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' হিসেবে আখ্যায়িত করা হলেও সেই বাংলাদেশী জাতীয়তার দৃষ্টিভঙ্গি অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ ছিল না এবং এতে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের সমস্ত উপাদানই উপস্থিত ছিল। জেনারেল জিয়ার শাসনামলেই ১৯৭৮ সালে ২য় ঘোষণাপত্র ৪নং আদেশ-এর মূলে উল্লেখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ পরিবর্তন করা হয় নিম্নোক্তভাবে- "সর্বশক্তিমান আল্লাহের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়বাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনায় মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

উক্ত আদেশ বলে সংবিধানের (১ক) নামে একটি নতুন দফা সংযোজন করে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই যাবতীয় রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর ভিত্তি' হিসেবে গৃহীত হয়। উক্ত আদেশ বলে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্বলিত ১২নং অনুচ্ছেদ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হয়। ১৯৮৮ সালে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীতে ২নং অনুচ্ছেদে (২ক) নামে একটি নতুন দফা সংযোজন করা হয় এভাবে- 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।'

এই সংশোধনীর ফলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহের জাতীয় পরিচিতি, ভাষা-সংস্কৃতি, ধর্ম, মৌলিক অধিকার প্রভৃতি হুমকির মুখে পড়ে। সাংবিধানিকভাবে আদিবাসীদের এই ভাষাগত ও জাতিগত পরিচয় সংকটের কারণে মূলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষা প্রচলন ও চর্চার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় এক ধরনের অন্তর্নিহিত ত্রুটি লক্ষণীয়। পাঠ্যক্রমে আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির এমন কোন ইতিবাচক উপাদান নেই যা একজন আদিবাসী শিক্ষার্থীকে আগ্রহী ও বিশ্লেষণী হতে শেখায়। আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা অর্জনের পথে যে বাধাগুলোর সম্মুখীন হতে হয় তার মধ্যে অন্যতম সমস্যা হল ভাষাগত সমস্যা। স্কুলের শিক্ষকগণ পাঠদান করেন বাংলা ভাষায় অথচ একজন আদিবাসী শিশু স্কুলে পদার্পণ করে তার মাতৃভাষাকে সম্বল করে। একজন বাংলা ভাষাভাষী শিশুর জন্য ইংরেজী ভাষাটি যেমন অপরিচিত ও দূর্বোধ্য, একজন আদিবাসী শিশুর জন্য বাংলা ভাষাও ঠিক তেমনি।

আদিবাসী শিশুরা যখন নতুন ভর্তি হয় তখন তারা যে ভাষা-অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে তা তাদের পরিবার ও সমাজের প্রচলিত ভাষা, যা তার পাঠ্য বইয়ের ভাষা বা পাঠদান মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত ভাষা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যার কারণে আদিবাসী শিশুরা পাঠের বিষয়বস্তুর সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না এবং যে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করার কথা তা করতে পারে না। ফলে পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার পর আরো বেশী অসহায় হয়ে পড়ে। বলা যায়, একই পাঠ্যক্রমের অধীনে একই সময়ে, একই পাঠদান পদ্ধতিতে আদিবাসী শিশুদের বাংলা ভাষাভাষী শিশুদের মত একই যোগ্যতা বা দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়।

আদিবাসী ও বাংলাভাষী শিশুদের দক্ষতা ও পাঠের বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা ভিন্ন ও অসম এবং এই ভাষাগত দূর্বলতার কারণে আদিবাসী শিশুরা অনেক বিষয় সমভাবে অর্জন করতে সক্ষম না হয়ে পর্যায়ক্রমে পিছিয়ে পড়তে পড়তে এক সময় প্রাথমিক স্তরেই ঝড়ে পড়ে। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শুধু প্রথম শ্রেণী থেকে শতকরা অন্তত ৩০ জন শিশু স্কুল ত্যাগ করছে আর মাতৃভাষা বিবর্জিত শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে আদিবাসী শিশুদের অবস্থা আরো বেশী শোচনীয়। ফলে একটি জরীপে দেখা যায় আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ঝড়ে পড়ার হার এলাকাভেদে ৬০% থেকে ৭০% হয়ে থাকে।[৩] তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাথমিক স্ত রে আদিবাসী ভাষা প্রচলনের বিষয়টি জরুরী হয়ে দাড়িয়েছে।

কিন্তু এখানে আরো কিছু কথা থেকে যায়। শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আদিবাসী ভাষায় শিক্ষা প্রচলন করলেই হবে না। বাস্তবক্ষেত্রে যদি আদিবাসীদের এই ভাষা প্রচলিত না থাকে বা চর্চা করার সুযোগ বা অনুকূল পরিস্থিতি না থাকে তাহলে এক্ষেত্রে আরো এক ধরনের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। যেমনটা আফ্রিকার বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের পর অনেক ক্ষেত্রেই এক প্রকার উভয় সংকট দেখা গেছে আফ্রিকায়, যেখানে ফরাসী, ইংরেজী বা পর্তুগীজ ভাষা ঔপনিবেশিক শক্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে সরকারী চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত প্রভাবশালী। আদিবাসী ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করে তারা ক্রমশ কর্মক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে পাশাপাশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে শিক্ষিত সমাজ থেকেও। ইংরেজ বিদ্বেষী আফ্রিকার সর্বত্র দেখা যায় যে, ইংরেজীই হল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নতির পথে মূল চাবিকাঠি এবং আফ্রিকার ক্লাসরুমগুলোতে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে পছন্দসই ভাষা। যার কারণে সমগ্র আফ্রিকাতেই মাতৃভাষা বনাম দ্বিতীয় ভাষা– কোনটি শিক্ষার মাধ্যম হবে তা নিয়ে বির্তক দেখা দিয়েছে।

ইউনেস্কো International literacy institute-এর বর্ণনা মতে যা নতুন সহস্রাব্দে আফ্রিকান দেশগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। আফ্রিকার দেশগুলোকে ইউনেস্কো মাতৃভাষা শিক্ষা প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রী ও অভিবাবকরা বিশ্বাস করে যে, মাতৃভাষার তুলনায় ইংরেজী ভাষায়ই স্কুলে ও কর্মক্ষেত্রে তাদেরকে বেশি সুবিধা দেবে। কেননা মাতৃভাষা তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু গবেষণায় জানা গেছে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীরা মাতৃভাষাতেই বেশি শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম এবং মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের ফলেই তাদেরকে ইংরেজীসহ অন্যান্য বিষয়েও দক্ষ করে তোলে।

বিশ্বায়নের যুগে ইংরেজী ভাষার অধিপত্য ও প্রভাবের কারণে আদিবাসীদের ভাষা ব্যবহার ও উন্নয়নের নীতিমালার জন্য যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা দরকার ছিল তা অনুপস্থিত। বরঞ্চ সমগ্র আফ্রিকাতেই আদিবাসীদের ভাষায় শিক্ষা পদ্ধতি পুরোপুরি কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও ভাষার বিভিন্নতা এই সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে। আফ্রিকার ৭০০ মিলিয়ন মানুষ কথা বলে অন্তত ১০০০টি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়। নাইজেরিয়াতে মাতৃভাষায় শিক্ষা পদ্ধতি চালু থাকা সত্ত্বেও দেখা যায়, ইংরেজী এখনো প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। যাই হোক, ইউনেস্কো বিশ্ব ব্যাংক-এর সাথে মিলে আফ্রিকার সরকারগুলোকে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছে। আদিবাসীদের ভাষায় শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতির জন্য তাদের শিক্ষা নীতিমালা যেন পর্যালোচনা করে।

আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মাতৃভাষায় শিক্ষা পদ্ধতি সফল করার বিষয়ে Peter Mwaura বলেছিলেনু For these policies to work suceessfully African governments need to enlighten the public about the validity and usefullness of policies that promote education in indigenous languages. they must also demonstrate more serious commitment to promoting those policies themselves, and allocatting adequate resources. Otherwise, the promotion of african languages will remain merely rhetorical and English will continue to take the pride of place at the expense of local languages.”[4] কিন্তু Peter Mwaura আফ্রিকার আদিবাসীদের মাতৃভাষা প্রচলনের ব্যপারে যে মন্তব্য করেছেন, তা শুধু আফ্রিকার আদিবাসীদের ভাষার জন্যই প্রযোজ্য নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ভাষা চর্চার ক্ষেত্রেও তার কথাটি প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে সরকারকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

মূলতঃ মাতৃভাষা বিবর্জিত এবং এক ভাষাকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার চেয়ে সমান্তরালভাবে মাতৃভাষাসহ দ্বিভাষিক (bilingual intercultural education) শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুদের শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে অধিক উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। ব্রাজিলের অধিকাংশ স্কুলে নিরঙ্কুশভাবে প্রচলিত ছিল জাতীয় ভাষা, পর্তুগীজ। যার কারণে টেরেনাভাষী শিশুরা শিক্ষার শুরুতেই পশ্চাৎপদ থেকে যায়। অনেকে পর্তুগীজ ভাষা বুঝতে না পেরে প্রথম শ্রেণীতেই অনেক বছর ব্যয় করে। ১৯৯৮ সালের নভেম্বরে একজন পদস্থ শিক্ষা অফিসার স্থানীয় স্কুলগুলো পরিদর্শন করে দেখলেন যে, প্রথম শ্রেণীর ৭৪% শিশুই পর্তুগীজ ভাষা পড়তে ও লিখতে পারে না। বিগত ৬

বছরের অধিককাল ধরে ৮টি টেরেনা গ্রামের স্কুলে ৫৫% শিশু প্রয়োজনীয় ভাষা আয়ত্ব করতে পারেনি, যার দ্বারা তারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পারবে। এই টেরেনাভাষী অঞ্চলে ঝড়ে পড়া শিশুর হার ছিল খুবই উঁচু। এই পরিস্থিতি অনেক স্থানীয় মানুষকে উদ্বিগ্ন করে তোলে।

একটি তরুণ টেরেনা দম্পতি Laucidio Sebastiao ও Lindomar বিষয়টি নিজেদের হাতে তুলে নিলেন। তারা একদল শিশুকে পড়াতে শুরু করলেন। শিশুরা টেরেনা ভাষায় পড়তে ও লিখতে শেখার পাশাপাশি স্কুলের পড়াশুনাও চালিয়ে গেল। দেখা গেল যে শিশুরা খুব দ্রুত টেরেনা ভাষায় পড়তে ও লিখতে শিখেছে, পর্তুগীজ ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত না করেই। নিজস্ব মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের ফলে যে আত্মবিশ্বাস তারা অর্জন করেছে সেই আত্মবিশ্বাসই তাদেরকে সহযোগিতা করেছে খুব দ্রুত ২য় ভাষা হিসেবে পর্তুগীজ ভাষা শিখতে। ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঘটনাটি সম্পর্কে Taunay এর টেরেনা অধ্যুষিত অঞ্চলের স্কুলগুলোর ব্যাপারে দায়িত্বশীল শিক্ষা সচিব অবহিত হলে তিনি Nancy Butler কে সেখানে দ্বিভাষাভিত্তিক একটি শিক্ষা প্রকল্প পরিচালনার প্রস্তাব দেন এবং ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ Grasso do sul-এর তিনটি গ্রামের স্কুলে এই শিক্ষা প্রদান শুরু করা হয়। Taunay-এর শিক্ষা সচিব ১৯৯৯ সালে জুন মাসে একই স্কুলগুলি যখন পুনঃপরিদর্শন করলে দেখা গেল পূর্বে যে শিশুরা শিক্ষা গ্রহণের সমস্যা ছিল তাদের ৭১% সহজে পড়তে এবং লিখতে পারছে টেরেনা ভাষায়। ফলে ১৯শে এপ্রিল ১৯৯৯ স্থানীয় সরকার একটি আইন পাশ করে যে, দ্বিভাষিক-আন্তঃসাংস্কৃতিক (Bilingual Inter-cultural) শিক্ষা টেরেনা অঞ্চলে মিউনিসিপ্যাল স্কুলগুলোতে বাধ্যতামূলক করা হয়।

ইউনেস্কোর অনেক গবেষণায় দেখা গেছে, মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদান করা হলে শিশুরা শিক্ষা গ্রহণে অধিক ভাল ফলাফল পেয়ে থাকে। নিউজিল্যান্ডে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, আদিবাসী মাওরী শিশুরা মাতৃভাষায় যারা শিক্ষা গ্রহন করেছে, তারা শুধুমাত্র ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা নেওয়া শিশুদের তুলনায় এগিয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার George Mason University-র একটি গবেষণা ইউনিট কর্তৃক ১৯৮৫ সাল থেকে ১৫টি রাজ্যের ২৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা ফলাফলের সাথে মাতৃভাষা শিক্ষার একটা প্রত্যক্ষ বা সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। সেই ছাত্ররা সবচেয়ে ভাল রেজাল্ট করেছে যারা দ্বিভাষিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিল।

ওয়াশিংটন ডি.সি.-র Center for Applied Linguistics-এর কনসালট্যান্ট Nadine Dutcher-এর মতে, মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের রয়েছে লোকজ ও ভাবোদ্দীপক মূল্য। সংখ্যালঘু ছাত্ররা এটি ব্যবহারের ফলে নিজেদের আরো বেশি সম্মানীয় বোধ করে। মাতৃভাষায় শিক্ষা ও বহুভাষিক শিক্ষার ক্রমবর্ধমান হারে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে সারা বিশ্ব জুড়েই। দ্বিভাষিক শিক্ষা বা বহুভাষিক শিক্ষার সাথে সাথে মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা ইউনেস্কোর ঘোষণাপত্রে একটি নতুন নীতিমালা। সর্বোপরি ভাষাকে এখন গণ্য করা হচ্ছে জনগোষ্ঠীর পরিচিতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে, যা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের উন্নয়নে ভাষার অপরিসীম গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়ে গেছে। বিশেষভাবে রাজনৈতিক প্রতিন্ধকতা এখানে উল্লেখযোগ্য।

ইউনেস্কো Promotion of Quality Education-এর সিনিয়র প্রোগ্রাম বিশেষজ্ঞ Linda King-এর মতে, "ভাষা বিষয়ক সকল সিদ্ধান্তই হচ্ছে রাজনৈতিক"। আবার ছাত্রদেরকে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে তিনি বলেছেন, "কিভাবে তাদের শিক্ষা দেয়া হবে সেই কলাকৌশলগত দিকও এখানে জড়িত। মূল বিষয়টি হলো স্কুল ব্যবস্থায় তাদের ভাষার প্রতি মনোযোগ ও বৈধতা দান করা । তার সাথে সাথে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে জাতীয় এবং বিদেশী ভাষায় প্রবেশাধিকার দান করা"। আবার ফরাসী লেখক Louis Jean Calvet-এর মতে, "ভাষাগুলোর যুদ্ধ হলো সবসময়ই একটি বৃহত্তর যুদ্ধের অংশ"।

মূলত আদিবাসীদের জীবনে ভাষা, সংস্কৃতি ও ভূমি- এই তিনটি বিষয় পরস্পর অঙ্গাঙ্গী ও অবিচ্ছেদ্যভাবে সংলগ্ন। ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে গভীর আত্মীয়তা। আদিবাসীদের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা যেহেতু ভূমির

উপর নির্ভরশীল সেহেতু আদিবাসীদের ভূমির সাথে ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নও জড়িত। পশ্চিমা জাতিরাষ্ট্রের ধারণায়ই সারা বিশ্বজুড়ে আদিবাসীদের ভাষা সংস্কৃতির বিকাশের পথে এক বিরাট অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে। যার জলজ্যান্ত উদাহরণ হতে পারে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহ। নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ অনুপস্থিতির কারণে এই আদিবাসীদের জাতিগত বিকাশ সাধিত হয়নি। অথচ আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ও বাইরে ভাষা চর্চার মতো অনুকূল বাস্তবতা সৃষ্টি করার মতো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহিত হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরাও জাতীয় সংস্কৃতির যথার্থ অংশীদারিত্ব অর্জন করতে পারত। যার কারণে মাতৃভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও সদিচ্ছা ব্যাপারটিও অস্বীকার করা যায় না।

যুক্তরাজ্যের Summer Institute of Linguistics-এর আন্তর্জাতিক কর্মসূচীর প্রাক্তন প্রধান Clinton Robinson এর মতে "for a Multilingual approach to work, governments must see linguistic divetsity as a boon and not a problem to be delth with. The speakers of those languages must also support it"।[৫] এক্ষত্রে আদিবাসীদের মাতৃভাষা প্রচলনের ক্ষেত্রে যথার্থ পরিভাষার ঘাটতিও কম প্রতিবন্ধকতা নয়। কেননা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ও বঞ্চিত ভাষাগুলোতে যথার্থ ব্যবহারের অভাবে আধুনিক সভ্যতার উপযোগী পরিভাষা তৈরি হতে পারেনি। যার জন্য আইনগত, ব্যবসায়িক, কুটনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত অনেক শব্দভান্ডার সৃজনের প্রচেষ্টা আবশ্যক। মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের পূর্বে এগুলোরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বম আদিবাসী জনগোষ্ঠির ভাষা গবেষণা করে তথ্য পাওয়া গেছে, সেই ভাষায় মাত্র ৩৫০ থেকে ৭০০ শব্দ রয়েছে। এর অন্যতম কারণ হলো দীর্ঘ দিনের অবহেলার কারণে এবং সামাজিক গতিশীলতার অভাবে আধুনিক সভ্যতার উপযোগি পরিভাষা যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হতে পরেনি।

ভাষা যেহেতু সংস্কৃতির বাহন, সেহেতু ভাষার মৃত্যুর সাথে সাথে কোন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিরও যে অপমৃতু ঘটবে একথা কোন মতেই অস্বীকার করার উপায় নেই। যার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষার জন্য তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলন ও বাস্তব জীবনে এই ভাষাগুলোকে চর্চা করার মত অনুকুল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেবার কোন বিকল্প নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের রয়েছে ভাষার লিখিত রূপাকার 'চাকমা প্রাইমার'। এছাড়াও লিখিত পাভুলিপি রয়েছে তাহ্লিক শাস্ত্র, শাঙেচ ফুলু তারা, আঘর তারা, রাধামন-ধনপুদী পালা, বৌদ্ধরঞ্জিকা প্রভৃতি। মারমা ও চাক জনগোষ্ঠীর রয়েছে ভাষার লিখিত রূপ 'চা আক্খ্রা'। এছাড়া মারমাদের রয়েছে হস্তলিখিত পাভুলিপি 'মনহারি পাংখুং', ককানু পাংখুং, থাম্রা পাংখুং, উদিনা কাপ্যা-প্রভৃতি। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর রয়েছে 'কক্বরক্ আদিশিক্ষা', ম্রো জনগোষ্ঠী রয়েছে ভাষার বিভিন্ন লিখিত রূপ থুরাই লাই-ক্লোউমি, তংমি তিয়া প্রাচহ্ প্রভৃতি ধর্মীয় গান, গল্প ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের গ্রন্থাবলী। খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী খুমিদের রয়েছে নিজস্ব ভাষায় রোমান বর্ণে লেখা বাইবেল ও ধর্মীয় সঙ্গীত। মায়ানমারে বিশপ জ্যাউঙ্গ কর্তৃক প্রণীত ২৮ পৃষ্ঠাব্যাপী খুমি ভাষায় লেখা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য 'খুমী-চা-আমাটিউ-ইয়াহ্-' নামক পুস্তক রয়েছে বলে জানা যায়।

বম, লুসাই ও পাংখোয়াদের বর্ণমালা মূলতঃ একই। এদের Bawm Bu-Bulbu নামক অক্ষর জ্ঞানের বই রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে একমাত্র খিয়াং জনগোষ্ঠীরই ভাষার কোন লিখিতরূপ নেই। এক্ষেত্রে বর্ণনাত্মক ভাষাতত্ত্বের (Discriptive linguistics) সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। এই বর্ণনাত্মক ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় প্রথমেই কোন ভাষায় ব্যবহৃত ধবনিগুলোকে চিহ্নিত করে কিভাবে ধ্বনিগুলো পরস্পর যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, সেই রীতিগুলো খুঁজে বের করা হয়। এরপর বর্ণনাত্মক ভাষাতত্ত্বের দ্বারা আন্তর্জাতিক ধ্বনিগত বর্ণমালার (International phonetic Alphabet-IPA) সাহায্যে ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগুলোকে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই IPA তৈরি করেছে ভাষাতত্ত্ববিদরা যার দ্বারা পৃথিবীর যেকোন ভাষাকে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব। পার্বত্য চট্টগ্রামের যে সমস্ত জনগোষ্ঠীর এখনো ভাষার কোন লিখিত রূপ নেই, তাদের ক্ষেত্রে IPA-এর মাধ্যমে প্রকল্প নেয়া যেতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউটগুলো (রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/ বান্দরবান)

প্রতিষ্ঠিত হবার পর আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতিগত কার্যক্রম কিছুটা গতিশীল হলেও এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্যক্রম আরো বেশি জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশিষ্ট লেখক ও মারমা ভাষা-প্রশিক্ষক ক্যশৈপ্রু মারমা ভাষা ও বর্ণমালা ব্যবহারের জন্য কয়েকটি প্রয়োগক্ষেত্র চিহ্নিত করেছিলেন:

১) মারমা সাহিত্য, মারমা অনুবাদ সাহিত্য ও সৃষ্টিশীল শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে,

২) গণশিক্ষা, গণসংযোগ, গণস্বাস্থ্য, নিউজ বুলেটিন সম্প্রচারের ক্ষেত্রে,

৩) ধর্মানুষ্ঠান, সামাজিক অনুষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় নির্বাচন, সাংগঠনিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে,

৪) মারমা সামাজিক ও প্রথাগত আইনকে সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে,

৫) মারমা মাতৃভাষা শিক্ষা, চর্চা ও বিকাশের কার্যক্রমে,

৬) ব্যানার, সাইনবোর্ড, পত্রালাপ, বার্তা প্রেরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে,

৭) আঞ্চলিক মারমা ভাষাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাষার সঙ্গে মৈত্রী-সেতুবন্ধন গড়ার ক্ষেত্রে,

৮) মারমা সামাজিক ক্রীড়ানুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে,

৯) সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণে, কুসংস্কার দুরীকরণে, নীতি-নৈতিকতাবোধ ও মূল্যবোধ সৃষ্টি কর্মে,

১০) মারমা অক্ষর জ্ঞান ভিত্তিক ওয়াল ম্যাগ, লিটল ম্যাগ, ম্যাগাজিন প্রকাশনা ও মারমা ভাষার গবেষণা কর্মে,

১১) মারমা সমাজ ও পরিবারে অক্ষরজ্ঞান প্রয়োগ কর্মে,

১২) অধুনা কম্পিউটারে মারমা ফন্ট সংযুক্ত হওয়ায় ঐ কম্পিউটারকে ব্যবহার,

১৩) মারমা শিশু -শিক্ষা ও মারমা ভাষা শিক্ষার কার্যক্রমে, প্রভৃতি।

উল্লেখ্য যে, মারমা ভাষা ও বর্ণমালা প্রয়োগের জন্য যে ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো শুধুমাত্র মারমা ভাষার জন্য প্রযোজ্য নয়, পার্বত্য চট্টগ্রমের সকল আদিবাসীর জন্যই এ ক্ষেত্রগুলো প্রযোজ্য ।

শেষ কথা ঃ

আলোচনার শুরুতে আমরা একটি গল্পের অবতাড়না করেছিলাম। গল্পে আদিবাসী শিশু বলিরামকে তার শিক্ষক মাতৃভাষার নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন। বলিরাম সঠিক উত্তর দেবার পরও তাকে শাস্তি পেতে হয়েছিল এবং তার শিক্ষকের প্রদান করা শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে স্কুল থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল। কিন্তু বলিরামের মত আর কোন আদিবাসী শিশুকে যেন এভাবে স্কুল থেকে পালিয়ে বাঁচতে না হয়, তার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ভাষা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচলন করা হোক এবং সেই ভাষাগুলো যাতে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ হতে পারে তার জন্যে অনুকূল বাস্তবতা তৈরি করা হোক। এবং এটাই হোক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সুপারিশ ঃ

১) আন্তর্জাতিক সনদগুলোর আলোকে আদিবাসী ভাষাগুলোকে রাষ্ট্রীয় বা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সরকারকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাবিত করা। এ লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় লবি ও ক্যাম্পেইন জোরদার করা।

২) গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমস্ত আইন, ঘোষণা, দলিল প্রভৃতি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ভাষায় প্রকাশ করা।

৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের যাবতীয় চুক্তি, আইন ও দলিলপত্রাদি আদিবাসীদের ভাষায় প্রকাশ করা।

৪) পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের বিভিন্ন সভায় প্রত্যেক সভ্য নিজ নিজ মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখার ব্যবস্থা করা ও দোভাষীর মাধ্যমে সেগুলি তর্জমা করা।

৫) পার্বত্য চট্টগ্রামের অফিস আদালতে আদিবাসীদের ভাষায় কাজ পরিচালনা করা, প্রয়োজনে অনুবাদের ব্যবস্থা করা।

৬) পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বতন্ত্র একটি শিক্ষাবোর্ড গঠন করে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দ্বিভাষিক (Bilingual) ও বহুভাষিক (Multilingual) পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করা এবং শিক্ষকদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহন করা। এ লক্ষ্যে আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতিকে পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা।

৭) আদিবাসীদের সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, সৃষ্টিশীল কর্মক্ষেত্রে, গণস্বাস্থ্য, গণশিক্ষা, গণসংযোগ, নিউজ বুলেটিন সম্প্রচার, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, সামাজিক অনুষ্ঠানাদি, রাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক নির্বাচন, সাংগঠনিক কর্মকান্ড, সামাজিক ও প্রথাগত আইন সংরক্ষণ-উন্নয়ন, মাতৃভাষা চর্চা ও বিকাশের কর্মক্ষেত্রে, ব্যানার তৈরি, সাইনবোর্ড তৈরি, পত্রালাপ, বার্তাপ্রেরণ, ক্রীড়ানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ, কুসংস্কার দূরীকরণ, নীতি-নৈতিকতার মূল্যবোধ সৃষ্টি, অক্ষরজ্ঞান ভিত্তিক প্রকাশনা (ওয়ালম্যাগ/লিটল ম্যাগ/ম্যাগ) প্রভৃতি ক্ষেত্রে আদিবাসীদের ভাষা ও বর্ণমালা ব্যবহার করা।

৮) জাতীয় প্রচার মাধ্যমে আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠান চালু ও সম্প্রসারণ করা।

৯) উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট-এর আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতি ভিত্তিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।

১০) যে সমস্ত জনগোষ্ঠীর ভাষার লিখিতরূপ নেই তাদের ক্ষেত্রে লিখিতরূপ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং এ লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন করা।

১১) আদিবাসীদের ভাষার অভিধান তৈরি করা এবং সৃষ্টিশীল সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বইপত্র আদিবাসীদের ভাষায় অনুবাদ করা।

==============

তথ্যসূত্রঃ

১। বাঙালীর জাতীয়তাবাদ- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ২০০০, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেডক্রিসেন্ট বিল্ডিং, ১১৪, মতিঝিল বা/এ, পোষ্ট বক্স-২৫১১, ঢাকা-১০০০।

২। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথমিক শিক্ষার মানউন্নয়নে আদিবাসী ভাষা প্রয়োগ সম্ভাবনা- সুখেশ্বর চাকমা, আমাঙ, ২০০৩ সম্পাদক-রনেল চাঙমা, জুম ঈসথেটিক্স কাউন্সিল (জাক), রাঙ্গামাটি।

৩। Making Local Laanguagees Count. By-Peter Mwaura. **Guardian** August 21, 2003

৪। EDUCATION - The mother tongue dilemma; UNESCO

৫। What Do You Lose When You Lose Your Language? Joshua Fishman, November 16, 1994.

সহায়ক রচনাবলীঃ

৬। উপজাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি - ভাষা বিষয়ক সেমিনার সংকলনঃ ১৯৯৯-২০০১; উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট, পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান।

৭। এই পৃথিবীর মানুষ- এ কে এম আমিনুল ইসলাম; বাংলা একাডেমি, ঢাকা। ১৯৮৫

৯। AMANI KOK -2002; Hill Tracts NGO Forum; রাজবাড়ী রোড, রাঙ্গামাটি।
৯। সংহতি, ২০০৩; বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বাড়ী-৩, রোড-২৫/এ; বানানী, ঢাকা, বাংলাদেশ।
১০। চেদ্‌না, ২০০৪; মারমা সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রকাশনা; বি.এম.এস.সি.কেন্দ্রীয় কমিটি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ভাষা সমস্যা

বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা

রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাগুলির সমন্বিত নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম। দিনে দিনে বাঙ্গালী অভিবাসনের ফলে বাঙ্গালীদের তুলনায় আদিবাসী জুম্ম জনগণের সংখ্যা হ্রাস পেলেও আসলে তারাই পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল বাসিন্দা বা আদিবাসী বলে স্বীকৃত।

আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠীগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এগারটি জাতিসত্ত্বায় বিভক্ত। দশভাষাভাষী এগারটি আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ আছে। সেগুলো হল- চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, পাংখোয়া, বম, লুসাই, খিয়াং, খুমি ও চাক। রিয়াং ও উসুই নামধারী দু' জনগোষ্ঠীকে কোন কোন ক্ষেত্রে পৃথক জাতিগোষ্ঠী হিসেবে দেখনো হলেও তারা মূলতঃ ত্রিপুরা জাতিভূক্ত। তবে তারা বর্তমানে ত্রিপুরা জাতি থেকে আলাদা জাতিসত্ত্বার দাবী নিয়ে পৃথক পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার জন্য আওয়াজ তুলছেন। আবার নগণ্য সংখ্যক হলেও গুর্খা ও আসাম (অহমিয়া) নামে দু' জনগোষ্ঠী লোক পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিতে বসবাস রয়েছে। তারাও পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল আদিবাসী জুম্ম জাতিগোষ্ঠীর ন্যায় জুম্ম অভিধায় পরিচিতি লাভ করতে চেষ্টা করছেন। নৃতাত্ত্বিক ভিত্তিতে সকলেই মংগোলীয় গোত্রভূক্ত। বর্তমানে সরকারীভাবে স্বীকৃত দশ ভাষাভাষী এগারটি জুম্ম জনগোষ্ঠী এবং রিয়াং ও উসুই যদি ত্রিপুরাদের থেকে আলাদা ধরা হয় এই তেরটি জাতিগোষ্ঠীর সাথে গুর্খা ও আসামদের বিবেচনায় আনলে পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট পনেরটি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী পাওয়া যাচ্ছে।

ইহা একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে, উপরে বর্ণিত এগারটি জনগোষ্ঠীর সকলেই নৃতাত্ত্বিকভাবে মংগোলীয় জাতিভূক্ত হলেও চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষা ভারতীয় আর্যভাষা (Indo-Aryan) গোত্রভূক্ত। অপরাপর জাতিগোষ্ঠীদের ভাষা বৃহত্তর তিব্বত চীন বা মংগোলীয় পরিবারভূক্ত। তাদের কারো কারো বর্মী ও বড়োদলভূক্ত, কারো কারো কুকি চিন দলভূক্ত। রাঙ্গামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের বর্তমান পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) শ্রী সুগত চাকমা (ননাধন) বিখ্যাত ভাষাবিদ ড. জি এ গ্রিয়ারসন-এর গবেষণা গ্রন্থের সহায়তায় "পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় ভাষা" রচনা করেন। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৮৮) এই গ্রন্থে দেখা যায় গ্রন্থকার আদিবাসী (উপজাতীয়) ভাষাগুলি কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। সেগুলি এই রূপঃ

ক. হিন্দ-আর্যভাষা (Indo-Aryan Branch) ভূক্ত ভাষা
- (১) চাকমা
- (২) তঞ্চঙ্গ্যা

খ. ভোট-বর্মী শাখা (Tibeto Burman Branch) ভূক্ত ভাষা
- (১) বর্মী দল (Burmese group) ভূক্ত ভাষা
- (২) মারমা

২. বোড়ো দল (Bodo group) ভূক্ত ভাষা
- (১) ত্রিপুরা
- (২) রিয়াং
- (৩) উসুই

৩. সাক-লুই (Sak-Lai) ভূক্ত ভাষা
- (১) চাক

৪. কুকি চিন দল (Kuki–Chin) ভূক্ত

(১) লুসাই

(২) পাংখোয়া

(৩) বম

(৪) খিয়াং

(খ) দক্ষিণ চিন দল ভুক্ত

(১) খুমি

৫. ম্রো–দল ভূক্ত

(১) ম্রো

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ থেকে বোঝা যায় আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীগুলোর ভাষা ভারতীয় আর্যভাষা ও ভোট বর্মী দু'টি প্রধান ভাষা পরিবার অন্তর্ভূক্ত। তবে ভোট বর্মী ভাষা পরিবারভুক্ত হলেও আরও কয়েকটি দলে বিভক্ত। চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যারা চাকমা বর্ণমালা ব্যবহার করেন। মারমাদের নিজস্ব বর্ণমালা আছে। লুসাই, বম, পাংখোয়ারা রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করেন। ইদানীং ম্রোদের বর্ণমালা আবিস্কৃত হয়েছে। ত্রিপুরাদের ককবরক বর্ণমালা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যবহৃত হলেও এখানে ব্যবহার করতে দেখা যায়।

ইহা সহজেই অনুমান করা যায়, পাশাপাশি বসবাস করলেও বিভিন্ন পরিবারভূক্ত ভাষা ব্যবহারকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলো পরস্পর বাক্য বিনিময়ে যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। তাদের মধ্যে সর্বজনবোধ্য ভাষা যা lingua Franca রূপে কাজ করতে পারে তেমন ভাষাও পাওয়া যায়নি। পাকিস্তান আমলের গোড়ার দিকে আমি দেখেছি আমাদের বিলাইছড়ি বাজারে ঠেগা এবং লুসাই হিল (বর্তমানে মিজোরাম) থেকে লাইকের (মিজো) কমলা নিয়ে আসত। তাদের সঙ্গে এভাবে কথা বলতে হয় (কারণ তাদের কথা আমরা বুঝি না) – বন্, এক আনা মাঝে কয়জন কমলা বেচিয়ে? (এক আনায় কয়টি কমলা বিক্রী করছ?) তুমি আমি বন থায়ে, এক আনা মাঝে দুইজন দে। (তোমরা আমাদের বন্ধু– কিংবা তুমি আমার বন্ধু– তাই এক আনায় দুইটি কমলা দাও)। তারা বলত– বন্, তুমি আমি বন্ থায়ে – আমি এক আনা মাঝে দ্বুবা কমলা দিব, তাত্তুন বেশি নদিব। (বন্, তুমি তগর আমি বন্ধু, তাই এক আনায় মাত্র দুটি কমলা দিব– তার চেয়ে বেশী দেব না)। এই রকম কথাবার্তার মাধ্যমে মাঝে মাঝে অন্যান্য আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে ভাববিনিময় করা হয়। মাঝে মাঝে স্থান ভেদে বিকৃত চট্টগ্রামী বাংলা ভাষার মাধ্যমেই পরস্পর কথাবার্তা হয়ে থাকে। দেখা যায় এই চট্টগ্রামী বাংলার বিকৃতরূপ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে এককালে Lingua Franca হিসেবে ব্যবহৃত হত। চট্টগ্রামী বাংলা হোক, কিংবা আদিবাসীদের যে কোন জাতিগোষ্ঠীর ভাষা হোক– একটা সর্বজনবোধ্য ভাষা নির্বাচন করতে হবে– যা আদিবাসী জুম্ম জাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে এবং বাঙালীদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারে।

আমাদের দেশ বাংলাদেশ। এদেশের বৃহ্তর জনগোষ্ঠী বাংলা ভাষাতেই কথা বলেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বাংলা ভাষা আমাদের আদিবাসীদের কারো মাতৃভাষা নয়। বাঙালীরা চাকমা তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা জানে না বা বোঝে না। আর বৃহত্তর মঙ্গোলীয় বা ভোট বর্মী, বোড়ো, কুকি চিন ভাষা তারা বুঝবেন বা জানবেন কি করে?

বাংলাদেশে বসবাস করতে হলে, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হলে, চাকুরী করতে হলে আমাদের অবশ্যই বাংলা ভাষা জানতে হবে বা আয়ত্ত্ব করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা শহর, উপজেলা বা থানা সদর এবং হাট বাজারগুলোতে বাঙালী সমাগম হওয়ায় সেসব স্থানের স্থানীয় আদিবাসী জনগণ অন্ততঃ ভাল বাংলা বলতে না পারলেও বা আয়ত্ত্ব করতে না পারলেও বাংলা কিছু কিছু বুঝতে পারেন তা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যেখানে বাঙালী সমাগম নেই সেসব জায়গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাধারণ লোকদের কাছে বাংলা ভাষা একেবারেই অপরিচিত এবং দুর্বোধ্য। কিন্তু বাংলা ভাষা না শিখলে তারা সরকারী চাকুরী পাবে কিভাবে, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করবে কিভাবে, এমনকি সাধারণ জীবন যাপন করতেও দিন দিন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে

হবে। বাংলা ভাষা আয়ত্ত্ব করা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। তাই একমাত্র প্রত্যেকের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভাষা জ্ঞান অর্জিত হলে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রভাষা জ্ঞান অর্জনে তার নিজেরাই সচেষ্ট হবে। তাদের অভ্যন্তর থেকেই এই চেতনা জন্ম নিলে বাইরের থেকে কেবল সহযোগিতা বা সহায়তা দিলে কাজ হয়ে যাবে।

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে চাকমা এবং তঞ্চঙ্গ্যাগণ সবাই কমবেশী বাংলা ভাষা জানেন। অনেকেই খুব ভাল আয়ত্ত্বও করতে পারেন। আবার লক্ষ্য করা গেছে– চাকমা এবং তঞ্চঙ্গ্যাদের পাশে বসবাসকারী অন্যান্য আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভার্য্যতলী মৌজার ম্রো হেডম্যান হৃদয় রঞ্জন রোয়াজা বর্তমানে বান্দরবানের দোয়ালক মৌজায় তাঁর আত্মীয় স্বজন নিয়ে বসবাস করছেন। ভার্য্যাতলী ম্রো পাড়াগুলো তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামের লাগোয়া। এই পাড়ার ম্রো নারী পুরুষ সবাই তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় অভ্যস্ত। আরো লক্ষ্য করা গেছে চাকমা গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রামে বসবাসকারী মারমা বা ত্রিপুরাগণ– অধিকাংশ নারী-পুরুষ চাকমা ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে থাকেন। ১১৬নং রাঙ্গামাটি মৌজায় কিলামুড়া গ্রামের ত্রিপুরাগণ নারী-পুরুষ, আবাল বৃদ্ধ সকলেই চাকমা ভাষায় অভ্যস্ত। চাকমা তঞ্চঙ্গ্যারা যেহতু সহজেই বাংলা ভাষা আয়ত্ত্ব করতে পারেন– চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায় অভ্যস্ত হলে অপরাপর আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীগুলোর পক্ষে বাংলা ভাষা আয়ত্ত্ব করা সহজ হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মংগোলীয় ভাষা পরিবারভূক্ত ভাষাভাষী আদিবাসী জুম্ম জনগণের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রচলন বা বাংলা ভাষাকে বোধগম্য করার কাজে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা একটি সহজ এবং কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে।

উপরে আমি চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা বার বার পৃথকভাবে উলেখ করেছি। আসলে তঞ্চঙ্গ্যা ভাষা বলে পৃথক কোন ভাষা নেই। তঞ্চঙ্গ্যারা যে ভাষায় কথা বলেন, তা চাকমা ভাষাই, তাকে চাকমা ভাষা বলাই সঙ্গত। পশ্চিম বাংলা, বাংলাদেশ এমন কি বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়– ঐ সবই বাংলা ভাষা। চট্টগ্রামী ভাষা, সিলেটি ভাষা, ময়মনসিংহী ভাষা বা দিনাজপুরী ভাষা বলে পৃথক পৃথক কোন ভাষা নেই– সবই একটি বাংলা ভাষা। তাই চাকমাদের ৪৬টি গোঝা এবং তঞ্চঙ্গ্যাদের ১২টি গোঝা যে ভাষা ব্যবহার করেন– তাদের শব্দসম্ভার উচ্চারণ এবং ঢং সবই চাকমা ভাষা এই নামে পরিচিত। এই কথা সবসময় আমাদের মনে রাখা উচিত বলে আমি মনে করি। বর্তমানে বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলা শব্দ উচ্চারণ, ঢং ব্যবহৃত হয়– সেই সব শব্দ সম্ভার শুদ্ধতা অবশ্য অপরিহার্য্য।

চাকমা ভাষা পার্বত্য চট্টগ্রামের মঙ্গোলীয় ভাষা গোত্রভূক্ত ভাষা ব্যবহারকারী আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীদের মধ্যে বাংলা ভাষা সহজবোধ্য করার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে তা আবার বলা যায়। লেখকদের প্রতি আমি অনুরোধ রাখব, চাকমাদের মধ্যে ৪৬টি গোঝা এবং তঞ্চঙ্গ্যাদের ১২টি গোঝা এবং সকল গোষ্ঠীদের মধ্যে যে সকল শব্দ, উচ্চারণ এবং ঢং ব্যবহৃত হয় সবগুলো চাকমা ভাষার অঙ্গবঙ্গে বিবেচনা করতে হবে বা স্বীকৃতি দিতে হবে। তাহলে চাকমা ভাষার একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ যেমন পাওয়া যাবে, তেমনি চাকমা ভাষা সমৃদ্ধ হবে। আমি সম্মানিত সুধী লেখকবৃন্দের কাছে আবেদন রাখব– ব্যাকরণ বিধি অনুসরন করে চাকমা ভাষাকে একটি Standard form-এ আনয়ন করতে হবে– যা সাহিত্য ভাষা বলে গণ্য হবে। এখনো আমরা চাকমা ভাষার পরিধি বা বিস্তৃতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে পারছি না– সেটা দুঃখজনক। এই সম্পর্কে আমি একটি উদাহরণ দিয়ে আমার প্রবন্ধ শেষ করলাম।

সম্প্রতি আমার একটি কবিতা চাকমা কবিতা নাম দিয়ে চাকমা সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশ করতে দিই। কবিতাটি ছাপানো হয়েছে কিন্তু কবিতার নীচে মন্তব্য লেখা হয়েছে এরূপ লেখকের ভাব, ভাষা অপরিবর্তিত রেখে ছাপা হলো। ইহার অর্থ আমি যা বুঝি, তা হচ্ছে কবিতাটিতে ব্যবহৃত শব্দগুলোই পত্রিকার সম্পাদকের মতে চাকমা ভাষার শব্দ কিনা নিশ্চিত নহেন। তাই লেখকের (তঞ্চঙ্গ্যা লেখক) ব্যবহৃত শব্দগুলো অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে যাতে চাকমা ভাষার শব্দ বলে সেগুলো পাঠকের ভ্রম না হয়। কবিতাটি এরূপঃ

“মন” (চিদ)

(চাকমা কবিতা)

মান্‌ঝ্যর চিদ্‌ত্তান অহ্‌ল তার মন
কেয়ানর মুড়ে মুড়ে কূয়ত থায়- ক্যয়ই ন’ জানন।
কন আলে দেখা ন’ পায়, ধরা ন যায় এ মনান।
তুয় তারে বুঝা যায়, লবো আঘে গদা জনমান।
চুবে চুবে গুবনে, আইলম তে আঘে
চেবার চায়, পেবার চায়, নানা আন গড়ত মাখে।
উড়ি যায় আঘাঝত, তারা লগে মিঝি যায়।
সাগরর তুবোন তুলে, কদ স্ববন দে’ধ চায়।
অন্‌ঝুর উঝোলা মন গড়ে- মিঝি যায়
দুখ পেলে বেজার অয়, বজং অয়, ভাঙ যায়
সুখ পেলে ভালেদ গড়ে, ভাঙা মন জড়া লয়।
কোচ্‌ পেলে ববা মনান র’ মেলি কথা কয়
এমনান ওলঝোল, এক হাক্কন ঠিক নথায়
যে মান্‌ঝ্যে গড়ে –সে মানঝ্যেই সুঘ পায়।
এমনান কূয়ত থায়, কি রং যে কথা খভ কেনে–
রিবাঙর মূড় মায়, পরানর গুভীনে।

“গম পাইচ্‌ মরে”

(তঞ্চঙ্গ্যা কবিতা)

যনি গম পাইচ্‌ মরে
ও পরানী, লাঙ্যাবী– যুনি গম পাইচ্‌ মরে
তর রুবোশ দেখেই দেঘেই
লালস ন দিচ্‌ মরে– যুনিগম পাইচ্‌ মরে।।
নিত্য রাঘেইচ্‌ সামালে – তর এগাভুরান
কলঙ্গি স্তরে ন’ পারেফা মর এগাভুর মনান!
লগে লগে থেবে তুই মর গদা জনমান–
তরমর দ্বিয়ান গ্যা, ভূয় দ্বিজনর পরান এক্কান।
তারপরঃ আয়ুমকালে মর মরনর পরে
খুলিদিচ চারকাত্যা ঘরচ জানালাউনরে
চুবে চুবে তুলি্‌দচ্‌ এক্কো ফুল মর বুগত
মর যেন কন কত্ত্য নয় মরনর দুঘত!
মুইযেন ভাবি–পারং ফুলর ধগ
পবিত্র এল মর গদা জনমান

কবিতাটির পাদটীকায় সম্পাদকের মন্তব্য দেখে আমি শিহরিত হই। কবিতায় যে শব্দগুলি ব্যবহার করেছি– আদৌ চাকমা ভাষায় শব্দ কিনা আমার সন্দেহ ঘনীভুত হয়। তাই পরবর্তীতে আর একটি কবিতা “তঞ্চঙ্গ্যা কবিতা” নাম দিয়ে ঐ পত্রিকায় পাঠাই। তা চাকমা সাহিত্য পত্রিকায় ঢাকা, ১৫ই ডিসেম্বর ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটি তুলে দেওয়া হল।

কারণ ঃ পবিত্রতার অর্থই অহ্‌ল গমপানাগান।

প্রবন্ধে ভাষাগত সমস্যার কথা আমি তুলে ধরলাম। সমাধান চিন্তাশীল লেখক গবেষকদের উপর ন্যস্ত রইল। □

হিল ট্রাক্টস এনজি ফোরাম, জুম ঈস্‌থেটিকস কাউন্সিল, কাপেং ও কেয়ার-বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে

আলোচনা সভা

২১ ফেব্রুয়ারী ২০০৫, শিল্পকলা একাডেমী, রাঙ্গামাটি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারী ২০০৪ হিল ট্রাক্টস এনজি ফোরাম, জুম ঈস্‌থেটিকস কাউন্সিল, কাপেং ও কেয়ার-বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়।

সকাল ৭.০০ ঘটিকায় সময় হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরামের চেয়ারপার্সন রাজা দেবাশীষ রায়ের নেতৃত্বে এ্যাডভোকেট ভবতোষ দেওয়ান, বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, দীপোজ্জল খীসা এবং কাপেং-এর পক্ষ থেকে উদ্ভাষন চাকমা ও মংসিংঞো মারমা প্রমুখ প্রতিনিধিবৃন্দ শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

এরপর সকাল ৯.০০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি পৌরসভা চত্বর থেকে শুরু হয় বর্ণাঢ্য র‌্যালী। এ র‌্যালী বনরূপা হয়ে শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। র‌্যালী উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট লেখক বাবু বীর কুমার তঞ্চঙ্গ্যা। র‌্যালীতে এইচটিএনএফের সদস্যভূক্ত রাঙ্গামাটিস্থ সকল এনজিওসমূহ, জাক, কাপেং, কেয়ার-বাংলাদেশ, ভাঝ আলাম গেইন ঝাক, রদং শিল্পীগোষ্ঠী, গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী ইত্যাদি সংগঠনসমূহ অংশগ্রহণ করে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজক চার সংগঠনের উদ্যোগে স্মারক টি-শার্ট প্রকাশ করা হয়।

বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে 'মায়ের ভাষায় পড়তে চাই' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে 'প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা চালুকরণ' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরামের চেয়ারপার্সন রাজা দেবাশীষ রায়। সভায় 'পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষায় আদিবাসী ভাষা প্রয়োগ ও প্রচলন' বিষয়ের উপর সিআইপিডি'র নির্বাহী প্রধান শ্রী জনলাল চাকমা এবং বাবু মৃণাল কান্তি ত্রিপুরা, বাবু: মংসিংঞো মারমা ও বাবু সুখেশ্বর চাকমা 'আদিবাসীদের ভাষা প্রচলন ও চর্চা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য শ্রী সুধাসিন্ধু খীসা, কেয়ার-বাংলাদেশ-এর পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক সমন্বয়ক বাবু প্রশান্ত ত্রিপুরা, হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরামের উপদেষ্টা শ্রী মঙ্গল কুমার চাকমা, রাঙ্গামাটি প্রেস ক্লাবের সভাপতি বাবু সুনিলকান্তি দে, আদি ও স্থায়ী বাঙালী কল্যাণ পরিষদের সভাপতি মো: ইউসুফ আলম, ইউএনডিপি'র পরামর্শক বাবু কীর্তি নিশান চাকমা প্রমুখ ব্যক্তি। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন এইচটিএনএফের সম্পাদক এ্যাডভোকেট ভবতোষ দেওয়ান। আলোচনা সভা শেষে জাক-এর ব্যবস্থাপনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়।

নিম্নে আলোচনা সভার আলোচকবৃন্দের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ বর্ননা করা হলো।

মাতৃভাষায় শিক্ষার ক্ষেত্রে আদিবাসীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংগঠনসমূহের উদ্যোগ নিতে হবে

কীর্তি নিশান চাকমা, উন্নয়নকর্মী

বেক্কুনরে পাত্তুরু তুরু! মাতৃভাষা দিবসে আমার মাতৃভাষার মাধ্যমে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা ও সম্মান জানাচ্ছি। আজকের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা যারা এইচটিএনএফ, জাক, কাপেইং ও কেয়ার-বাংলাদেশ, সম্মানিত আলোচকবৃন্দ সকলকে আবারো অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি খুব একটা সময় নেব না। আমাকে বলা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক শিক্ষায় আদিবাসীদের ভাষা প্রয়োগ সম্পর্কে বলতে। এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ আমাকে দেয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি পেয়েছি এখানে পৌছার পর। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি নিয়ে আমার আলোচনা করার কথা না। কিন্তু যেহেতু বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যতা ও সংশ্লিষ্টতা আছে সেহেতু আমি বলবো কারো বক্তব্য বিচ্ছিন্ন নয়। যা হোক এখানে একটা কথা বলি যে, এ ক্ষেত্রে আমার কিছু নিজস্ব চিন্তাধারা আছে। প্রথমেই বলছি লেখক যে প্রেক্ষাপটে তার লেখা উপস্থাপন করেছেন, সেটার ভাষা কেবল মানুষের সাংস্কৃতিক, সামাজিক অস্তিত্বই নয়, নেপথ্যে একটি রাজনৈতিক বিষয়ও জড়িত থাকে।

বাংলাদেশের জন্ম-উৎপত্তি ঘটে এই মাতৃভাষা দিবসের সংগ্রামের মাধ্যমে। দ্বিতীয় যে বিষয়টি এনেছেন মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের বিভিন্ন দিকগুলো, এনেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর উদাহরণগুলো। তিনি খুব সুন্দরভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন। প্রবন্ধের অন্যান্য দিকগুলোর মধ্যে বিভিন্ন আঙ্গিকে তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এনেছেন। স্বাভাবিকভাবে আমরা সবাই জানি এবং মানি যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা চালু করার ক্ষেত্রে কারো কোন দ্বিমত বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকার কথা নয়। কিন্তু লেখক উদাহরণের মাধ্যমে যেভাবে বক্তব্যকে উপস্থাপন করেছেন, তাতে খুব সম্ভবত কোন যুক্তিই খাড়া করা যায় না এর বিপরীতে। আদিবাসী ভাষা প্রচলনের ক্ষেত্রে আইনগত ভিত্তি আছে তা তুলে আনা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক আইনে, জাতিসংঘের বিভিন্ন বিশেষায়িত সংস্থা, আইএলও কনভেশন প্রভৃতিতে বিষয়গুলো স্বীকৃত হয়েছে। এ বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের চূক্তিতেও অর্ন্তভূক্ত হয়েছে। এখন আমরা সবাই বলছি মাতৃভাষার মাধ্যমে লেখাপড়ার বিষয়টি জরুরী- এটা অবশ্যই করতে হবে, কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু সমস্যাটা এখন আমাদের মত ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর, মাইনরিটির একটি বাস্তব সমস্যা। এ ব্যাপারে সমস্যা সমাধানের জন্য কিভাবে সম্ভব, কোথায় সম্ভব হবে, সেই সাথে বিভিন্ন সমস্যার কথাও আলোচনা হয়েছে এবং কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন আমরা হতে পারি।

পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানিক প্রেক্ষাপটে এ ধরনের সমস্যার স্বরূপ আমরা বুঝতে পারি। এখানে আমি বলবো একটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও আছে। তার সাথে বিশেষ করে আমাদের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর একটা আবেগের ব্যাপারও আছে। সবাই জানে আমাদের পরিচয় কি? প্রত্যেক মানুষেরই পরিচয়ের একটা ব্যাপার আছে। আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রেও বিষয়টি ভিন্ন নয়। কিন্তু তারপরও এখানে কিছু কিছু সমস্যা এবং জটিলতা আছে। আমি হরফের কথায় আসছি। হরফের বাইরে যে সমস্যাটা আছে তা হল একটা সাধারণ বানান পদ্ধতি। আমরা যে কোন ভাষা বা চাকমা ভাষার কথা বলি না কেন, যে শব্দগুলো আমরা উচ্চারণ করি, সেগুলোর আসল বানান কি? সঠিক অর্থে সাধারণ যে বানান- যেমন ধরুন বাংলাতে, বাংলা বানান যদি লেখি তাতেও মতের অমিল রয়েছে।

আমরা ৯৭-এ চূক্তির মাধ্যমে একটা স্বীকৃতি পেয়েছি কিন্তু সেটার কোন বাস্তবায়ন নেই। জিনিসটি কবে, কিভাবে হবে সেটা চিন্তা করতে হবে। সময় সংকীর্ণ। আমি বেশী সময় নেব না। এ বিষয়ে আমাদেরকে আরো বেশী চিন্তা ভাবনা করতে হবে। এখানে আইনগত বা প্রাতিষ্ঠানিক একটা ক্ষেত্র আছে বা স্বীকৃতি আছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সদিচ্ছার অভাব। এ বিষয়টার সাথে জড়িত অন্যান্য ইস্যুগুলো। এ ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যদি স্বীকৃত না হয় এবং সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্রগুলোতে যদি মাতৃভাষা শিক্ষার প্রবেশাধিকার না মিলে, তারপরও আমাদের দায়িত্ব থেকে যায় যা আমাদেরও সচেতনভাবে চিন্তাভাবনা আছে। কিন্তু এখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা প্রচেষ্টার একটা সীমাবদ্ধতা আছে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা এখানে মুখ্য এবং সেক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা খুব সম্ভবত আমাদের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে সমস্ত সংগঠন আছে তাদের উদ্যোগটাই বড় ধরনের ভূমিকা

রাখতে পারবে। এ ব্যাপারে এ ধরনের আলোচনা সভা আয়োজন করতে হবে আরো বেশি পরিমাণে। এ উদ্যোগটা কিভাবে আরও জোরদার করা যায় আমাদের ভাবতে হবে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে

সুনিলকান্তি দে, সভাপতি, রাঙ্গামাটি প্রেস ক্লাব

আন্তর্জার্তিক মাতৃভাষা উপলক্ষ্যে 'মায়ের ভাষায় পড়তে চাই' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত আজকের এই আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি, শ্রদ্ধেয় আলোচকবৃন্দ এবং সুধীমন্ডলী। আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করবো না। ইতিমধ্যে প্রবন্ধটি আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। আমি যে প্রবন্ধটির বিষয়ে আলোচনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, সেই প্রবন্ধের প্রবন্ধকার তিনজন যথা- মৃনাল কান্তি ত্রিপুরা, মংসিংঞো মারমা ও সুখেশ্বর চাকমা। আমি আলোচনার শুরুতেই তাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো যে, এ দীর্ঘ প্রবন্ধে যে সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন এবং এ উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন সেজন্য। তারা তাদের এ প্রবন্ধের শেষের দিকে যে এগারটি সুপারিশ করেছেন সেই সুপারিশগুলো করার ক্ষেত্রে তাদের তিনজনের যে সম্মিলিত প্রয়াস রয়েছে তার জন্য আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আজকের এ প্রবন্ধকারদের উপস্থাপিত প্রবন্ধটি আমাদের সকলের কাছেই আছে এবং প্রবন্ধে যদি গভীরভাবে মনোনিবেশ করি, একটি কথা ফুটে উঠে- ভাষা কেবল কথা মাত্র নয়, ভাষা একটি জনগোষ্ঠীর স্বরূপ নিদর্শনও। এই কথাটি দিয়ে আজকের আলোচনা শুরু করতে চাই। একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আন্ত র্জাতিকভাবে গর্বিত হয়েছে এবং ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদযাপন করা হচ্ছে। কিন্তু ২০০৫ সালে এসে আমরা কি দেখতে পেলাম? একটি রাজনৈতিক সংগঠন, চারদলীয় জোটের একটা অংশ তাদের নেতৃত্বে এখন জোর গলায় দাবী করছে যে, মাতৃভাষা আন্দোলনে মুসলমানরা ব্যতীত কারো কোন ভূমিকা ছিল না। কেননা তাদের যুক্তি হচ্ছে- শফিক, রফিক, বরকত, সালাম- চারজনেই মুসলমান ছিলেন। আমি কথাটি তুলেছি এ জন্যে, যে বৃহৎ আন্দোলন থেকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মিলেছে, যে দিনটিকে তাদের নিজেদের বলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আপন করে নিল; সেই দিনটিকে দখল করে অন্যভাবে প্রবাহিত করে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করা হচ্ছে, ঠিক তখন এই পার্বত্য চট্টগ্রামেই বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আদিবাসী ভাষা কিভাবে প্রয়োগ করা যাবে সে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। এমতাবস্থায় কোন রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের দাবি নিয়ে আজ আদিবাসীদের ভাষাকে তাদের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রচলন করতে পারব? এ বিষয়টিও স্পষ্ট করতে হবে এবং এটি চূড়ান্ত অর্থে বিচার্য করতে হবে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকার করতে হবে। আমি প্রবন্ধকারদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এটা লেখার জন্য যে, এটি সত্যিই একটি রাজনৈতিক বিষয়। ঠিক এমনিভাবে ১৯৫২ সালে সংগঠিত মাতৃভাষা আন্দোলনের পরেই একটি মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়। আমাদের দেখতে হবে একে অপরকে স্বীকৃতি দিয়ে আমরা আজকে একে অপরকে কতটুকু দিতে পারছি। যেহেতু এখনও দেখা যায় যে, অনেক রাজনৈতিক নেতৃত্ব বাংলাদেশে আদৌ আদিবাসী বসবাস করেন কিনা এ সম্পর্কে আগের দ্বিধাদ্বন্দ্বে রয়েছে। যেহেতু তাদের কাছে Indigenous Peoples-এর সংজ্ঞা স্পষ্ট নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে যারা বসবাস করছেন তারা আদৌ আদিবাসী কিনা এ নিয়ে সন্দেহ রয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের মধ্যে, একটি ভ্রান্ত ধারনা রয়েছে। এ ভ্রান্ত ধারনাটি যতদিন অনুধাবন করা যাবে না ততদিন পর্যন্ত এ সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করে যেতে হবে। তারপর আমাদেরকে রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে কমিটমেন্ট আশা করতে হবে।

আমি শুরুতেই বলেছিলাম আলোচনা দীর্ঘায়িত করবো না। আলোচনা দীর্ঘ না করে এই একটি প্রচার নিয়ে আমি বলছি ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও

তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে আদিবাসীদের মাতৃভাষার শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলনের মাধ্যমে তাদের ভাষাকে বিকশিত করার যে সুযোগটি রয়েছে তার বাস্তবায়নে এ প্রতিষ্ঠানগুলো আদৌ ভূমিকা পালন করেছে কিনা, এ বিষয়টা অবশ্যই আমাদের অনুধাবন করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর বাংলাদেশ সরকারের কারিকুলাম বোর্ডের পক্ষ থেকে জেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে চেষ্টা করা হয়েছিল কিভাবে আদিবাসীদের মাতৃভাষাকে শিক্ষা কারিকুলামের অন্তর্ভূক্ত করে তাদেরকে RPO অন্তর্ভূক্ত করা যায়। কিন্তু আর তেমন এগোয়নি। বিষয়টা এভাবেই থেকেই গেল।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, যে সরকার চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল তারাও চুক্তি বাস্তবায়ন করেনি এবং বর্তমান সরকারও আগের সরকারেরই পথই অনুসরন করছে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর দীর্ঘ সাত বছরেও এ বিষয়ে কোন সমাধানে তারা পৌঁছতে পারেননি। পার্বত্য জেলা পরিষদে যারা দায়িত্বে আছেন তারা কোন অবস্থাতেই বাঙ্গালী নন। চেয়ারম্যানও উপজাতি বা আদিবাসী এবং অবশ্যই শিক্ষিত ব্যক্তি। এই ব্যক্তিদের কোন কমিটমেন্ট এখনো পর্যন্ত আমরা দেখতে পেলাম না । যখন মানিক লাল দেওয়ানকে আমরা প্রধান অতিথি করে নিয়ে এসেছিলাম- এ শিক্ষার বিষয়টি নিয়ে, তিনি সেখানে বলেছেন, আদিবাসীদের ভাষার উন্নয়নে পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা যায় তাহলে বোধহয় আমাদের আদিবাসী ভাষার উন্নতি হবে। এ বিষয়টা আমাদের অনুধাবন করতে হবে। এ বিষয়টা অনুধাবন করতে হবে এ জন্যে যে, আমরা যারা চিন্তা ভাবনা করছি বা আপনারা যারা চিন্তা ভাবনা করছেন, আমাদের চিন্তাধারার বাস্তবায়নে, সুযোগ গ্রহণে তারা অবকাঠামো দিতে পারবে, কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করতে পারবে।

আপনারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ভাষাকে নিয়ে, শিক্ষায় তা প্রয়োগ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছেন। আজকের এ সেমিনারে বিষয়টাকে একটা পুরো প্ল্যাটফরম হিসেবে গ্রহণ করে যারা এই কাজ করেছেন বা করার চেষ্টা করেছেন তাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ উদ্যোগ সফল হতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিকরণের জন্য তাদের ভাষাকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার এ উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করা যাবে যদি সকলের সম্মিলিত প্রয়াস থাকে। পরিশেষে আমাকে কিছু বলার সুযোগ দানের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার ভাষাগুলোকে স্বীকৃতি দেয়ার সময় এসেছে

ইউসুফ আলম, সভাপতি, আদি ও স্থায়ী বাঙালী কল্যাণ পরিষদ

মায়ের ভাষায় পড়তে চাই- এই শ্লোগানকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আলোচনা সভার শ্রদ্ধেয় সভাপতি, সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, সুধীবৃন্দ সবাইকে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা। আমি প্রথমে মহান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুরু করছি। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের দশটি ভাষা রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের যেমন সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই ভাষারও তেমন কোন স্বীকৃতি নেই। কিন্তু আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার ভাষাগুলোকে স্বীকৃতি দেয়ার সময় এসেছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা যেমন- চাকমা, মারমা, তংচংগ্যা বা ত্রিপুরাদের বর্ণমালা ও তাদের ভাষাগুলো যাতে অন্তর্ভূক্ত হয়। আদিবাসীদের মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের সুশীল সমাজ, লেখক, সাংবাদিক, সরকারী দায়িত্বে কর্মরত সকলকে সহযোগিতা করতে হবে। মাতৃভাষা প্রচলনের জন্য শুধু একদিন আলোচনা করলেই হবে না। সবাইকে অনুরোধ করব, যাতে এই আদিবাসী মাতৃভাষাকে আরো বেশী জোরদার করতে পারে তার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আলোচনা সভা বা সেমিনার আয়োজন করতে এবং প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। আদিবাসী ভাষাগুলোকে মানুষের একেবারে কাছাকাছি পর্যায়ে নিয়ে আসা যায় তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

মাতৃভাষায় ভাব প্রকাশ করা যেমন বক্তৃতা দেয়া, মাতৃভাষায় শ্লোগান লেখা হয় অর্থাৎ মাতৃভাষায় সবকিছুই সহজে উপস্থাপন করা যায়। কিন্তু মাতৃভাষা ছাড়া কোন কিছু প্রকাশ কঠিন হয়। পরিবারে মায়ের কাছে, বাবার কাছে বা ভাইয়ের কাছে, বোনের কাছে যখন মাতৃভাষার কথা বলে পরির্বতীতে স্কুলে গিয়ে যখন ভিন্ন কোন ভাষা শোনে তখন তা বোঝা যে কোন শিশুর পক্ষে কঠিন হয়ে দাড়াঁয়। তাই মাতৃভাষায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার ছেলেমেয়েদের, বিশেষ করে প্রাইমারী স্কুলে যেন মাতৃভাষায় শিক্ষা দেয়া হয়। অন্তত প্রাথমিক স্কুলে হলেও যাতে এই শিক্ষা দেয়া যায় তার পদক্ষেপ নিতে হবে। তারপরেই ভবিষ্যতে মাধ্যমিক স্তরেও চালু করা যাবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের বিষয়টি লেখা আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা পরিষদ, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ভাষা যাতে বিকাশ হতে পারে তার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং সরকার যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ভাষা স্বীকৃতির বিষয়ে এগিয়ে আসে তার দাবী জানাচ্ছি। এক্ষেত্রে আমি এবং আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতা করবো। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মাতৃভাষায় শিক্ষা চালুকরণে সকল পর্যায়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকতে হবে

প্রশান্ত ত্রিপুরা,পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক সমন্বয়ক, কেয়ার-বাংলাদেশ

শুভ অপরাহ্ন, সবাইকে শুভেচ্ছ জানাচ্ছি। শ্রদ্বেয় সভাপতি, সম্মানিত আলোচকবৃন্দ এবং সুধীবৃন্দ আমি খুব সংক্ষেপে আমার আলোচনা শেষ করব। কারণ অনেকখানি বলা হয়ে গেছে, তেমন কিছু যোগ করার নেই। আমাকে যে বিষয়ে বক্তব্য দিতে বলা হয়েছিল সেখানে তেমন কিছু যোগ করার নেই। কি কি কাজ করার দরকার তারও একটি তালিকা আমরা দেখছি।

একটা জিনিস আমি শুধু এখানে প্রস্তাব করতে চাই যে, যে কাজগুলো করার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো কে করবে সেটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে হবে এবং কাউকে না কাউকে এগিয়ে আসতে হবে। কে করবে, কি কি করতে হবে, একটা ইচ্ছা পূরণের তালিকা প্রণয়নের পাশাপাশি প্রশ্ন হচ্ছে কে কাজগুলো করবে? এ বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের ভাবা দরকার। কিছু কিছু জিনিস আমাদের হিসেবে রাখতে হবে। তবে গোড়াতেই একটি জিনিস দরকার সেটা হচ্ছে, নিজেদের নিয়ে সচেতনতা।

আমার মায়ের ভাষা ধরে রাখার প্রাথমিক তাগিদটা আমার মধ্যে আসতে হবে, উদ্যোগটাও আমাকেই নিতে হবে। সে উদ্যোগটি যদি থাকে, তাগিদ যদি থাকে, সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব। আর সেই তাগিদ ও উদ্যোগ না থাকলে কিছুই হবে না। কাজেই আত্মসচেতনতার পাশাপাশি আজকের প্রচেষ্টাও থাকা দরকার। সেদিক থেকে দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমাদেরকে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটা প্রতিবেদন দাখিল করা যেতে পারে- গত বছর আমরা কি কাজটি করেছি তার খতিয়ান। সেটা ব্যক্তিগতভাবে হতে পারে, আবার প্রতিষ্ঠানিকভাবেও হতে পারে। মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে আমরা কি কি কাজ গত বছর করেছি। আগামী বছর এই কাজগুলো করতে চাই। এ ধরনের অনুষ্ঠানে সেগুলোর প্রতিবেদন দেওয়া উচিত। আমার মনে হয়, দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো পার্বত্য জেলা পরিষদ বা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। গতবছর তারা কি করেছে আমরা দেখতে চাই, হিসাব নেবার উপলক্ষ হিসেবে আমরা এ ধরনের অনুষ্ঠান ব্যবহার করতে পারি। তাতে বোধহয় আমাদের সম্মিলিত প্রয়াসটা আরেকটু গতিশীল হবে।

আমি এটুকুই বলবো মাতৃভাষার শিক্ষা গ্রহণ প্রত্যেকটি শিশুরই অধিকার। প্রত্যেক শিশুর অধিকার আছে নিজের ভাষায় পড়ার। অন্যদের দায়িত্ব আছে শিশু যেন সেই অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। মূল কথা হচ্ছে যে, সে যেন বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। এর মধ্যে কয়েকটা দিক আছে- অনেক টেকনিকাল বিষয় আছে-

অনেক জটিলতাও আছে- এ সর্ম্পকে একটা স্বচ্ছ নিখুঁত ধারণা থাকতে হবে। এবিষয়ে বহুমুখী পদক্ষেপ নেয়া যায়। যে কাজগুলো করার দরকার সেই ব্যাপারে যোগ্য জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি, প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান সবাইকে সম্পৃক্ত করতে হবে। পাশাপাশি রাজনৈতিক সদিচ্ছা সকল পর্যায়ে থাকতে হবে। এটা পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে যেমন বুঝতে হবে, তেমনি বাঙ্গালীদের বিষয়টা বুঝতে সংবেদনশীল হতে হবে। সংখ্যাগত সমস্যাটি বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে আরো বেশী প্রযোজ্য।

আমরা যদি খিয়াং জনগোষ্ঠী নিয়ে চিন্তা করি, একজন খিয়াংকে অনেক কিছু খোঁজ রাখতে হয়। সেটা হয়ত একজন চাকমা বা ত্রিপুরাকে এতটা মাথা ঘামাতে হয়না, কিন্তু একজন খিয়াংকে ভাবতে হয়। একজন চাকমা যেমন মারমা বা ত্রিপুরা বা খিয়াং জনগোষ্ঠীর ভাষা না শিখেও তার কাজকর্ম চালাতে পারবে কিন্তু একজন খিয়াং বা ত্রিপুরা বা ম্রোর পক্ষে চাকমা বা মারমা বা বাংলা ভাষা না শিখে চলবে কি করে? আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচেছ সংবেদনশীলতা। এই সংদেনশীলতার মধ্য দিয়ে এই চর্চাটি শুরু করতে হবে। আমাদের দেশে বাংলা ভাষাভাষী বাঙ্গালীদের যদি সংবেদনশীলতা না থাকে, রাজনৈতিকভাবে দাবিদাওয়া অস্পষ্ট থেকে যাবে। সে কারণে কাজ করা দরকার।

আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, সম্পদের বিষয়টা এখানে জড়িত- খুব বেশী টাকা পয়সা নয় কিন্তু সে ধরনের বরাদ্দ থাকা দরকার। আমরা যদি চিন্তা করি যে, ভাষা উন্নয়নের জন্য কি কি কাজ করা দরকার, কিরূপ বাজেট দরকার ইত্যাদি যদি আমাদের কাছে পরিস্কার থাকে, আমি বলব আমরা আরেকটু বেগবান করতে পারব। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টাগুলো অব্যাহত রাখতে হবে। আর একটা জিনিস বলে শেষ করব যে, চেষ্টাগুলো চালিয়ে যাবার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যেই এই উপলব্ধি নিয়ে আসা দরকার- যেমন মাতৃভাষায় শিক্ষা একথাটার র্অথটা কি?

আমরা কি এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা চাই- সব ছেড়ে শুধু একটা ভাষায় শিক্ষা নেওয়া নাকি অন্য কিছু। এ বিষয়গুলো আমার মাথায় কাজ করে যে, সমস্যাগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে কর্মসূচি হাতে নেওয়ার ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপঙ্খু খতিয়ে দেখা দরকার। তা নাহলে অনেক ক্ষেত্রে কিছুটা আবেগ জড়িত হয়ে এমন কোন সিদ্বান্ত আমরা নিয়ে নিতে পারি যে, যেটা সুচিন্তিত না বা ভাল করে তলিয়ে দেখা হয় নাই। তাহলে সেটা হতে বিপরীত ফলও আসতে পারে। এইটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণের বিষয়টি ভাবতে হবে

মঙ্গল কুমার চাকমা, উপদেষ্টা, হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরাম

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি, বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ ও সুধীবৃন্দ সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রথমেই শ্রদ্ধা জানাই যারা এই মহান দিবসকে প্রতিষ্ঠা করার আত্মত্যাগ করেছেন সেই বীর শহীদ সালাম, বরকত, জব্বারদের। তাদের আত্মবলিদানের ফলে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের মধ্য দিয়ে আজ আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী জাতিসমূহ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভের দাবী জানাতে সক্ষম হচ্ছি।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ একটি জন্মগত মৌলিক অধিকার। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ১০৭নং আদিবাসী ও উপজাতি বিষয়ক কনভেনশনে আদিবাসীদের উক্ত অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারও উক্ত কনভেনশনকে স্বীকৃতি বা অনুস্বাক্ষর করেছে। ফলে এটা বাংলাদেশের আইনে রূপান্তরিত হয়েছে।

অপরদিকে ১৯৯৭ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। উক্ত চুক্তি মোতাবেক ১৯৯৮ সালে সংশোধিত পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনেও অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। সুতরাং আইনগত দিক থেকে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ স্বীকৃত রয়েছে। এখন প্রয়োজন তাকে কার্যে রূপান্তরিত করা, প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর ও উক্ত চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে অন্তর্ভূক্তির পর প্রায় ছয় বছরাধিক কাল অতিক্রান্ত রয়েছে। কিন্তু সরকার বাস্তবায়ন করছে না বা পার্বত্য জেলা পরিষদের ক্ষমতায় যারা রয়েছেন তারা কার্যকর করার যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করছে না।

আমরা জানি, আজ বছরের পর বছর ধরে পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। যে দল ক্ষমতায় আসুক না কেন তাদের লোকগুলোকে মনোয়নয়ন দিয়ে পার্বত্য জেলা পরিষদগুলো পরিচালিত হচ্ছে। নির্বাচনের মাধ্যমে মনোনীত না হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাদের কোন দায়বদ্ধতা নেই। তাদের দায়বদ্ধতা হচ্ছে ঢাকার নিয়োগ কর্তৃপক্ষের উপর। ফলে উপরওয়ালার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে পার্বত্য জেলা পরিষদগুলো পরিচালিত হচ্ছে। এজন্যেই আজ প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা চালুকরণ সম্ভব হচ্ছে না।

প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা চালুকরণের বিষয়টি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উপর নির্ভরশীল। এটা স্রেফ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা চালুকরণের দাবী করার মধ্য দিয়ে অর্জিত হতে পারে না। এটা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট থেকে দেখতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে আরো একটা দিক বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সেটা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে পাহাড়ীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা। এটা বাস্তবায়িত না হলে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার কাজ বরাবরই বাধাগ্রস্ত হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সরকারী বিভাগীয় কার্যালয় থেকে শুরু করে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন তারা অধিকাংশ বহিরাগত। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ স্বাতন্ত্র অবস্থা, বিশেষ শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এবং এখনাকার অধিবাসীদের বিশেষ অধিকার সম্পর্কে অবহিত নন কিংবা সংবেদনশীল নন। পক্ষান্তরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জুম্ম বিদ্বেষী এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী ও উগ্র সাম্প্রদায়িক মানসিকতারই অধিকারী। তারা কখনোই প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা চালুকরণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবে না। বরং নানা ক্ষেত্রে অতি সুক্ষ্মভাবে বাধা সৃষ্টি করে যাবে। তাই প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা চালুকরণের বিষয়টি চুক্তির অন্যান্য বিষয়গুলোর বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত রয়েছে।

সাধারণভাবে জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তথা মূলস্রোতধারার সংস্কৃতি সাথে আদিবাসীদেরকে অঙ্গীভূত করার প্রক্রিয়াকে জোরদার করে। পাঠক্রম এমনভাবে তৈরী করা হয় যেখানে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি আদিবাসী শিশুদের গ্রাস করে ফেলে। এজন্য বহুভাষিক ও আন্তঃসাংস্কৃতিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন অত্যন্ত জরুরী। অন্যদিকে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষানীতি আদিবাসী শিক্ষা প্রসারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই জাতীয় শিক্ষানীতিতে আদিবাসীদের বিশেষ ধারা বা ব্যবস্থা থাকা দরকার অথবা আদিবাসীদের জন্য আলাদা শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা দরকার।

এখন একটা বিশেষ প্রস্তাব নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। জানি না এটা প্রাসঙ্গিক হবে কিনা। যদি অপ্রাসঙ্গিক হয় আশা করি ক্ষমা সন্দুর দৃষ্টিতে দেখবেন। মূলতঃ চিন্তা করার জন্য আমি প্রস্তাবটা উপস্থাপন করছি। সেটা আমি বন্ধুবর প্রশান্ত ত্রিপুরা থেকে পেয়েছি। আমি তার একাট বাস্তব দিক দেখতে পেয়েছি। সেটা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী দশটি ভাষা রোমান হরফ দিয়ে লেখা। এর পেছনে অন্যতম যুক্তি হচ্ছে-

প্রথমতঃ দশ ভাষাভাষি এগারটি জাতির একটা ইউনিক হরফ হবে। দশ ভাষার জন্য একই হরফ হলে এগার জাতির মধ্যে ঐক্য-সংহতি আরো জোরদার হবে।

দ্বিতীয়তঃ যারা নিজ ভাষা ছাড়াও অন্য জাতিসত্বার ভাষা জানেন তারা রোমান হরফ হলে সহজে উক্ত ভাষাও পড়তে পারবেন। যেমন কোন শিক্ষিত মারমা যদি ত্রিপুরা ভাষা বলতে পারেন এবং মারমা ভাষা যদি রোমান হরফ দিয়ে লেখা হয় তাহলে তার পক্ষে সহজেই মারমা পড়া সম্ভব হবে। কিন্তু মারমা হরফ দিয়ে লেখা হলে তার পক্ষে মারমা ভাষা পড়া সম্ভব হবে না। নতুবা আরও নতুন করে মারমা হরফ শিখতে হবে। অনুরূপভাবে ককবরক ভাষা জানেন এমন মারমা ব্যক্তির পক্ষেও সহজে রোমান হরফে লেখা ককবরক ভাষা পড়তে পারবেন।

তৃতীয়তঃ পাঠদানের ক্ষেত্রেও শিক্ষকের পক্ষে সহজ হবে। যেমন বান্দরবানে মারমা নন এমন শিক্ষকের পক্ষে মারমা ভাষা শিক্ষা দেয়া হতে পারে। কেননা অধিকাংশ লোক বান্দরবানে কমবেশী মারমা ভাষা জানেন। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি বা খাগড়াছড়ির ক্ষেত্রে মারমা বা ত্রিপুরাদের অনেকে চাকমা ভাষা পড়াতে পারবেন।

চতুর্থতঃ রোমান হরফ হলে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে সহজেই তথ্য প্রবাহে প্রবেশ করা যাবে। চাকমা বা মারমা হরফ হলে হয়তো সেটা তত সহজ হবে না।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিশেষ করে চাকমা এবং মারমাদের পক্ষে উপরোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ কঠিন হবে। কেননা তাদের নিজস্ব বর্ণমালা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে স্ব স্ব বর্ণমালার প্রতি তাদের একটি প্রচন্ড মায়া বা সেন্টিমেন্ট থাকবে। তারা সহজে এটা ছাড় দিতে রাজী হবে না। তবে বৃহত্তর স্বার্থে এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সাথে তাল মিলানোর স্বার্থে এগারটি জাতির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ট এ দুটো জাতির সেক্রিফাইস করা যেতে পারে।

যা হোক এটা এখনি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে তা বলছি না। চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করার জন্য প্রস্তাবটা উথাপন করলাম মাত্র।

সামগ্রিকভাবে ভাষাসহ জুম্ম সংস্কৃতির উপর আগ্রাসন ও হুমকি রয়েছে। শুধুমাত্র একটা উদাহরণ দেবো। সেটা হচ্ছে আদিবাসী ভাষায় প্রচলিত স্থানের নাম বাংলাকরণ বা ইসলামীকরণ। যেমন 'হ্দে মরা'কে বাংলা করা হয়েছে 'হাতিমারা'। 'জগনাতলী'কে বলা হয় 'জাহানাতলী'। 'নাহ্নাচর'কে করা হয়েছে 'নানিয়ারচর'। 'খবংপর্য্যা'কে লেখা হয় 'খবংপড়িয়া'। পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বোচ্চ পাহাড় 'তাজিনদং'কে একসময় 'বিজয়' নামকরণ করার চেষ্টা করা হয়। 'ফালিটাঙ্যা চুগ'কে 'পাকিস্তান টিলা' নামকরণ করা হয়। রাঙ্গামাটি শহরের বুকে রাঙ্গাপানির কাছে পুলিশ লাইনের নামকরণ হয় 'সুখী নীলগঞ্জ'। তার পাশেই রয়েছে 'ফিলিস্তিন বাগ' নামে একটি স্থান। এভাবে আজকে আমাদের স্থানের নামগুলিও অবলুপ্তি করা হচ্ছে। ভাষাসহ গোটা আদিবাসী সংস্কৃতিকে বিলুপ্তি পথে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। সবাইকে ধন্যবাদ।

মাতৃভাষা বা নিজের ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা যদি নিতে পারি তাহলে মানুষের পরিপূর্ণতা আসবে

সুধাসিন্ধু খীসা, সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

এইচটিএনএফ, জাক, কাপেং, কেয়ার-বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ব মাতৃভাষা দিবসের এই আলোচনা সভার আমার রাজাবাবু ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায় এবং মঞ্চে উপবিষ্ট আলোচকবৃন্দ। উপস্থিত সুধীমন্ডলী সবাইকে আমি সুখ শান্তি মঙ্গল কামনা করে আলোচনায় অংশগ্রহণ করছি। এটা হল আন্তজার্তিক মাতৃভাষা বিদস। চাকমায় বলব নাকি বাংলায় বলব- তা নিয়ে আমি গত পরশু থেকে অনেক চিন্তা করেছি। প্রবন্ধকারের কাছ থেকেও প্রশ্ন করেছি কি ভাষায় বলব? কতক্ষণ বলব? সময় কত? তিনি বিস্তারিত বলতে পারেননি। তিনি একটা কথা বলেছেন যে, ভ্াংলায় বলবেন। আমার বোধ হয় বাংলায় বলা উচিত হবে কারণ তিনি কিন্তু মারমা। আমি যদি চাকমা ভাষায় বলি, আমার দৃর বিশ্বাস তিনি বুঝবেন না। খাগড়াছড়ি বা রাঙ্গামাটির অধিবাসী হলে তিনি

চাকমা ভাষা বুঝতেন। অসুবিধা হত না। যেহেতু বান্দরবন হতে এসেছেন স্বাভাবিকভাবেই চাকমা ভাষা বুঝাটা ওনার জন্য কষ্টকর হবে। একজন হলেও ওনার সম্মানার্থে আমি বাংলায় বলব। কারণ আমি জানি যে, বাংলাদেশের চৌদ্দকোটি মানুষের মধ্যে আমরা আট লক্ষ এই পার্বত্য চট্টগ্রামে এই সরকার তো আমাদেরকে সেই উদারতা দেখাতে পারছেন না। এখানে অধিকাংশ চাকমা হয়েও যদি আমি এই জিনিসটি যদি ব্যবহার করি আমার মনে হয়, ঠিক সরকারের ঐ জিনিসটাই করা হবে।

আমার আলোচনার আগে আমার স্মৃতি থেকে ছাত্র জীবনের অর্থাৎ খুব সম্ভবত ৩য় বা ৪র্থ শ্রেণীর ২টা কবিতা বলেই আমার আলোচনা শুরু করতে চাই। প্রথমটা হল বাংলা ভাষা। মোদের সোনার বাংলা ভাষা/সকল ভাষার চাইতে খাসা/প্রাণের চেয়ে প্রিয় সে যে/সবার চেয়ে ভালবাসা। এই ভাষাতেই স্বপন দেখি/এই ভাষাতেই লেখা লিখি/ফুলের বুকে গন্ধ যেমন/বাংলা ভাষা মোদের তেমন।

আমি এই কবিতাটা বুঝতাম না, শুধু মুখস্থ করতাম এবং মুখস্থ করে গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতাম। তখন আমি ভাবলাম যে, বাংলা ভাষা কেন হবে? আমাদের ভাষা হবে না কেন? তখন আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, কেন আমাদের চাকমা ভাষায় হবে না? স্যারকে তো ঐ প্রশ্ন করতে পারিনি।

আরেকটি কবিতা ছিল যে, পাকিস্তানের অভাব কি ভাই, পাকিস্তানের অভাব কি? বরিশালে চাউল আছে, ঢাকায় আছে পাওয়া ঘি/ যশোর জেলায় আছে ভাই পাটলী গুড়ের গাছ, ফরিদপুরে কি মজাদার পদ্মা নদীর ইলিশ মাছ, খুলনায় আছে গাছে গাছে নারিকেল পান সুপারী, পাকিস্তানের অভাব কি ভাই, পাকিস্তানের অভাব কি? ...

এই কবিতায় সব জেলার নাম আছে কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাটা ছিল না। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার নামটি নাই কেন? আমি স্যারের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, স্যার কিন্তু যথাযথ উত্তর আমাকে দিতে পারেননি। তিনি বলেছেন, কবি লিখেন নাই। পরে আমার পরিপূর্ণ জীবনে বিশেষত আমি যখন ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজে পড়তে যাই তখনই বুঝলাম যে, কেন কেবল আঠারোটা জেলার কথা নিয়ে কবিতাটিতে আছে, আর কেন আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাটার কথা নাই। এই দুইটা কবিতা আমার তখনকার শিশু মনে যে প্রভাবটা ফেলেছিল সেটা আজকের দিনে 'মায়ের ভাষায় পড়তে চাই' দাবী এবং কেন কবিতাটিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল না সেটা এখন বুঝি।

আমি মনে মনে ভেবে দেখি, আমি অবশ্য মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষা খুব ভালভাবে বলতে পারি না, আমার নিজের ভাষা ছাড়া বাংলা, ইংরেজী, কিছু কিছু হিন্দি বুঝি এবং হিন্দী-উর্দু লিখতে পারি- তার পরে ধরুন কিছু কিছু মারমা ভাষা জানি কিন্তু কোনটার উপর আমার সে ধরনের দক্ষতা নাই। তারপর আমি দেখলাম যে, আমি যখন স্বপন দেখি তখন তো বাংলায় কোনবার স্বপ্ন দেখিনি, অন্য কোন ভাষার স্বপন দেখিনি। সবই আমার নিজের ভাষাতেই স্বপ্ন দেখি।

আজকের উপস্থাপিত প্রবন্ধ দু'টাই পড়েছি। আমি যেটা দেখেছি তা সংক্ষেপে হল- প্রথম প্রবন্ধটি সাধারন- আর দ্বিতীয় প্রবন্ধটি বিশেষ। সাধারণ মানে হচ্ছে, মাতৃভাষা প্রচলন এবং চর্চা। মাতৃভাষার মাধ্যম শিক্ষা না হলে, সে শিক্ষার পরিপূর্ণতা বা একটা মানুষের পরিপূর্ণতা আসে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। এর আগেও অনেক ভাষা হারিয়ে গেছে। ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। যাই হোক এখানে কিছু কিছু আলোচনা করার অবকাশ হয়তো ছিল ঠিক সেভাবে আমি যাবো না। আমি শুধু এটুকুই বলবো যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পদ্ধতি চালু হোক। মাতৃভাষা বা নিজের ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা যদি নিতে পারি তাহলে মানুষের পরিপূর্ণতা আসবে এই বিষয়ে বোধ হয় এখানে উপস্থিত আমাদের কারোর কোন সন্দেহ নেই।

পাশাপাশি এটাও ঠিক যে, এখানে আমরা যারা আছি আসলে আমরাই অপসংস্কৃতি বলি আর নিজের ভাষাটা একপাশে রেখে অন্য ভাষায় যাওয়া, এই প্রক্রিয়ারই বাহক আমরা। এটা অস্বীকার করলে আমাদের বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হবে। যারা সত্যিকার অর্থে আজো লেখাপড়া অর্থাৎ আধুনিক লেখাপড়ায়, বাংলা-ইংরেজীতে

শিক্ষিত হননি ওনারা কিন্তু নিজ নিজ ভাষা- তিনি চাকমাই হোন বা মারমাই হোন বা যে জাতিরই হোন, সেটা ধরে রেখেছেন। কিন্তু আমরা যারা যে আধুনিক শিক্ষা পেয়েছি, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বলে দাবী করতে চাই, তারাই বোধহয় বেশি করে আমাদের নিজের ভাষাটা আমরা হারিয়ে ফেলতেছি।

এখানে একটা বিষয় বলা দরকার যে, এখানে একটা রাজনৈতিক সদিচ্ছার ব্যাপার জড়িত। আমি বিশ্বাস করি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন কঠিন তো নয়ই, অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। যেহেতু সমাজ বিকাশের গতিধারায় আজকের আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা এসেছে। রাষ্ট্র হলো সার্বভৌম, সরকার ইচ্ছে করলে, সরকারের যদি সদিচ্ছা থাকে বা থাকত, তাহলে এতদিন পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থায় আদিবাসী ভাষার প্রচলন হতো। আপনারা জানেন বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। এখানে সরকারের যে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব রয়েছে সে বিষয়ে সবাই অবগত আছেন। আমিতো দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির সাথে জড়িত আছি। সেই পাকিস্তান আমল থেকে আজ পর্যন্ত এই দেশের শাসকগোষ্ঠী এ ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাগুলোকে অধিকার দিতে চায় না।

আমি মনে করি আমাদের ব্যাপারে কারো সদিচ্ছা নেই। বিগত তিনটা বছরে আমি ঢাকায় টানা কয়েক মাস ছিলাম। আমার নেতৃত্বও আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিকভাবে বিএনপি নেতা, মন্ত্রী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শুরু করে প্রায় ৫০/৬০ জনের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছি। আমি যাদের সাথে কথা বলেছি, অনেকে আন্ত রিকভাবে কথা বললেও কোন সমস্যার সমাধান হয়নি। আর আপনারা নিশ্চয়ই সবাই জানেন, দেশে এখন চরম সংকট চলছে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা চরম অবনতি হয়েছে। ক্রসফায়ারে মানবাধিকার লংগিত হচ্ছে। দেশে কারো জীবনের নিশ্চয়তা নেই। এমতাবস্থায় আদিবাসীদের অবস্থা আরো দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। আমাদের অবস্থা কি হবে? আজকে 'মায়ের ভাষায় পড়তে চাই' এবং প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা প্রচলন চাই এটা দাবী করছি। এটা তো আইন রয়েছে। আইনে পার্বত্য জেলা পরিষদের দায়িত্ব রয়েছে। এই আইনকে কার্যকর করার জন্য একটা কার্যপ্রণালী বিধি বা Rules of Business থাকতে হবে। Rules of Business হবার পরে তার একটি প্রবিধান প্রণীত হবে। প্রবিধান প্রণীত হবার পরে এটা কার্যকর করা হবে। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিগত ৭ বৎসরে কিছুই হয়নি। অনুরূপভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যবিধিমালা আজো পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি। বোবারা স্বপ্ন দেখলেও যেমন বলতে পারে না ঠিক আমাদেরও তাই হয়েছে।

আমরা আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব তা করে যাচ্ছি। আমার ধারণা বর্তমান সরকার কখনও চুক্তি বাস্তবায়ন করবে না। তবু ও আমরা কাজ করে যাচ্ছি, বৈঠক করেছি। আর চুক্তি বাস্তবায়ন না হলে তাহলে 'মায়ের ভাষায় কথা বলবো', 'প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা প্রচলন' কতটুকু অর্জিত হবে? পাশাপাশি আমি বলতে চাই যে, মানুষ আশাবাদী। আমাদের হতাশ হলে চলবে না। সরকার বাস্তবায়ন করবে না এটা সত্যি। সরকার যাতে করতে উদ্যোগী হয় তার জন্য কি কি করতে হবে, সেটাও করতে হবে।

পাশাপাশি আমাদের যেটুকু সম্ভাবনা আছে সেই সম্ভাবনাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি। এর মধ্যে কি কি থাকতে পারে? প্রয়োজনে সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করে যেতে হবে। একটা সংগঠনের লক্ষ্য যদি আমরা পূরণ করতে চাই, মায়ের ভাষায় যদি পড়তে চাই, আমাদের শিশুদের যদি মায়ের ভাষায় পড়াতে চাই, যদি আমরা পরিপূর্ণতা আনতে চাই, তাহলে অবশ্যই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্যই বলুন আর বাহ্যিক শর্তকে সক্রিয় করার জন্যই বলুন যেভাবেই হোক না কেন অবশ্যই সংগঠন করতে হবে। পরিশেষে আমাকে কিছু বলার সুযোগ দানের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাতৃভাষায় লেখাপড়া করা শিশুরা শুধু মাতৃভাষায় না, অন্যান্য ভাষায়ও পারদর্শী হয়

রাজা দেবাশীষ রায়, চাকমা সার্কেল চীফ ও চেয়ারপার্সন, হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরাম

সমবেত শ্রদ্ধাভাজন নেতৃবৃন্দ, মুরুব্বীবৃন্দ, প্রবন্ধকার, আলোচকবৃন্দ ও সুধীজন সবাই আমার নমস্কার গ্রহণ করবেন। আমি সর্বপ্রথমে আয়োজক চার সংগঠনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাতে চাই এবং ক্ষমা চাইছি যে, আমরা ঠিক প্রোগ্রাম অনুসারে আমাদের আলোচনা কিছুটা কাটছাট করতে হয়েছে সময়ের জন্য। আমি বেশী সময় নেব না। আমারও আজকে আসলে মনের সাধ রয়েছে যে, নিজের ভাষায় বলবো। ব্যাপারটা ভেবে দেখলাম, কিছুটা আমাদের শ্রদ্ধেয় আলোচক শ্রী সুধাসিন্ধু খীসা মহোদয়ের মতো করে ভাবলাম- না, আমি চাকমা ভাষায় বলবো না। কিন্তু দু'একটা ছিটেফোটা মিশিয়ে দেবার সে অধিকার রাখি যেহেতু আজকে মাতৃভাষা দিবস এবং আমার মাতৃভাষা চাকমা।

সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, হয়ত দু'একজন হলেও চাকমা কথা বুঝতে পারবে না। সেটা অন্যায় হয়ে যাবে, যেহেতু আমাকে সভা পরিচালনা বা শেষের দিকে কিছু বলার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেহেতু অন্যায়টা বড় রকমের হয়ে যাবে। আবার পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংখ্যার দিক থেকে এবং শক্তির দিক থেকে চাকমারা সংখ্যাগুরু। প্রশান্ত বাবুর সাথে একমত পোষণ করে বলতে চাই যে, অবশ্যই সংখ্যায়-শক্তিতে যারা বড় তাদের আরো বেশী খেয়াল রাখতে হবে। সেটা বলে আমি কয়েকটা কথা শুরু করতে চাচ্ছি।

আমি আলোচনা থেকে কিছুটা- যা আমার স্মরণে আছে, আমার কিছু কিছু ব্যক্তিগত মতামত আমি মিশিয়ে দেব। মূলত আমি মাতৃভাষায় পড়তে চাই এর উপরই বলতে চাই। আমি বলতে চাই যে, কেন এবং কিভাবে আমরা যারা জড়িত আছি আমাদের স্বপ্নটা কি? মায়ের ভাষা চালু করতে গিয়ে যদি আমাদের স্বপ্ন অনুসারে না হয়, তাহলে সে দুঃস্বপ্নটাই বা কি? তার আগে একটা জিনিস একটু করে বলতে চাই, আমাদের অনেকের নিজের ভাষা বলার জন্যে অনেক সময় স্কুলের শিক্ষকের কাছ থেকে মারও খেতে হয়েছিল, অপমানিত হতে হয়েছিল। আমরা যারা মাতৃভাষার কথা বলছি, ছোট বেলা থেকেই অনেকের মধ্যে সেই মার খাওয়ার বেদনা রয়েছে, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন ভাষাভাষী পাহাড়ী সদস্য অনেকের মধ্যে রয়েছে।

আমার মনে আছে আমি ছোট বেলায় প্রথম চট্টগ্রামের একটা স্কুলে ভর্তি হতে গিয়েছিলাম। তখন আমি বাংলা মোটামুটি বুঝি। কিন্তু বলতে গেলে একটু আটকাতো। কিন্তু পড়তে গেলাম ইংরেজী মিডিয়াম স্কুলে। হেড মিস্ট্রেস ছিলেন একজন এ্যাংলো ইন্দিয়ান, ইউরোপীয় বংশোদ্ভুত, হয়তো বাঙ্গালীর রক্ত থাকতে পারে। স্থানীয় আদিবাসীর রক্তও থাকতে পারে। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন একটা কথা আর আমি হা করে দেখেছিলাম। বুঝি নাই। বাংলা তো কিছু বুঝি- বাংলাও না। ইংরেজীও না। আমাকে উনি ইংরেজী ধাঁচে উর্দুতে বললেন। পরে বুঝলাম যে বই কোথায় জানতে চাচ্ছেন, তোমহা-রা কিতাব কাঁহা। কথাটা আমি একবারেই বুঝি নাই। এজন্য আমাকে গালিও খেতে হয়েছিল। বাংলার সুরে উর্দুই বলেছিলেন তিনি। যেহেতু উর্দু ভাষাভাষী বেশী ছিল আমাদের স্কুলে। এরকম অনেক ছাত্র-ছাত্রী নিশ্চয়ই এই বেদনা পায়।

এখানে একটা জিনিস স্মরণ রাখা প্রয়োজন, মাতৃভাষার অধিকারের মধ্যে দুটো দিক আছে। একটা হল শিশুর ব্যাক্তিগত অধিকার। মাফ করবেন আমি আইনের দিকটা নিয়ে আসছি। আরেকটা হল একটি জাতির, একটি জাতি গোষ্ঠীর, একটা জাতিসত্ত্বার, একটা গ্রুপের অধিকার। এটা তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক অধিকার। সাংস্কৃতিক অধিকার ব্যক্তিগতও হতে পারে- সেটা একটা গোষ্ঠীরও হতে পারে। একটা জাতিরও হতে পারে। তার স্বকীয়তা বজায় রাখা, তার সংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদি প্রস্ফুটিত করে তোলা, সেটাকে উন্নয়ন করা। এখন এ দুটো একসঙ্গেও যেতে পারে আর কোন কোন ক্ষেত্রে একটার সাথে একটার দ্বন্দ্বও থাকতে পারে।

আমাদের চ্যালেঞ্জটা হবে যে, এখানে দ্বন্দ্ব না রেখে বা দ্বন্দ্ব কম করে একটা শিশুর অধিকার যা তার মাতৃভাষায় শিক্ষা নিতে পারে। মাতৃভাষা ব্যবহার করে যাতে স্কুলে থাকতে পারে। শ্রী সুধাসিন্ধু বাবুও বলে গেছেন যে, মাতৃভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে যাতে শিশুরা স্কুলে লেখাপড়া করতে পারে। আরেকটা দিক হল, মাতৃভাষা কি একটা বিষয় হিসেবে থাকবে নাকি যতগুলো বিষয় আছে সবগুলোই তার মাতৃভাষার মাধ্যমে হবে? একজন

শিক্ষক মারমা ছেলেকে মারমা ভাষায় বুঝিয়ে তিনি বাংলাও শেখাতে পারেন। যা হোক উক্ত দু'টো থেকে কোনটা কিভাবে নিরসন করবো সে বিষয়ে ভাবতে হবে সকলের।

আমি এখন আমি স্বপ্নে যাই। যতই স্বপ্ন দেখি কিন্তু একটা জিনিস বদলে যাবে না যে, বহুজাতিক গ্রাম, শহর বা বিভিন্ন অঞ্চল রয়েছে অর্থাৎ কোন একটা এলাকায় যদি একশজন ছাত্র থাকে, ওখান থেকে যদি ৪০ জন বাংলা ভাষাভাষী হয়। ৩০ জন চাকমা ভাষাভাষী হয়। বাকি ৩০ জন যদি আরো চারটা ভাগে হয়। তখন বাস্তবে করবটা কি? তখন অবশ্যই অন্যায় হলেও ঐ সংখ্যায় বেশী যারা সেই ভাষাভাষীর Option-টা আমাদের অগ্রাধিকার দিতেই হবে। তখন হয়ত বাকি যারা আছে সেই Option-টা পাচ্ছে না।

অধিকারটা পার্বত্য চুক্তিতে স্বীকৃত হয়েছে। শিশু অধিকার সনদ Convention on the Rights of Child, তারপর আইএলও কনভেশন বা আদিবাসী ও উপজাতি বিষয়ক কনভেশন বা চুক্তি রয়েছে, বাংলাদেশ সরকার সবকটি অনুমোদন করেছে অর্থাৎ বাংলাদেশের আইনের অংশ হিসেবে আমাদেরকে ধরে নিতে হবে। সেগুলোতে সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

মাতৃভাষায় শিশুর লেখাপড়া করার অধিকার স্বপ্ন দেখি। আমাদেরকে একটি কারণে স্বপ্ন দেখতে হবে। পরিস্কার ও সুস্পষ্ট স্বপ্ন দেখতে হবে। কোথায় যাচ্ছি? কোথায় আমাদের লক্ষ্য? কোন এলাকায় জনসংখ্যা কতবেশী? কোন এলাকায় কয়জন শিক্ষক? কোন পন্থায় শিক্ষকদের ট্রেনিং দিতে পারবো? এখন আমাদের সময় এসেছে খুব Details-এ গিয়ে স্বপ্ন দেখা। এখানেই হচ্ছে আমাদের চ্যালেঞ্জ। আমাদের যে চারটি সংগঠন আছে, আমাদের মাঝে আজকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও রয়েছেন, সুশীল সমাজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আছে তাদের সঙ্গে মিলে আমরা কাজটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। আমার ব্যক্তিগত মতামত একটু বলে গেলাম। আমাদের অনেক Details-এ গিয়ে আলোচনা করতে হবে যে, একদিন-দুদিন-তিনদিন, অনেকগুলো কর্মশালা বা বৈঠক ইত্যাদি করতে হবে।

এখন আমি ফিরে যাই ঐ দুটো মূল প্রশ্নের উত্তরে। আমি কিভাবে বুঝি এবং কেন? প্রবন্ধের মধ্যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে এসেছে যে, আমাদের সাংস্কৃতিক অধিকার একটা গোষ্ঠীর, একটা জাতির পরিচয়ের বাহক। কিন্তু আরেকটা দিক আছে সেটা হচ্ছে অত্যন্ত ব্যবহারিক দিক। এটা প্রবন্ধ দুটোতেও খুব পরিষ্কারভাবে এসেছে। এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে আরো বিভিন্ন রাষ্ট্রে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে। গবেষণা হয়েছে যে, মাতৃভাষায় যারা শিক্ষা শুরু করেছে ও মাতৃভাষায় যারা শিক্ষা শুরু করে নাই। এই দুই ধরনের ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে গবেষণা হয়েছে যে, কে কতখানি তার শিক্ষা জীবনে উন্নতি সাধন করতে পেরেছে? গবেষণায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে শিশুরা মাতৃভাষায় লেখাপড়া করেছে, তারা শুধু মাতৃভাষায় না এবং অন্যান্য ভাষায়ও পারদর্শী এবং ওদের Intellectual development বা IR Development যেটাকে বলে সবদিক থেকে ওরা অন্যান্য শিশুদেরও তুলনায় অনেক বেশী এগিয়ে। সুতরাং মাতৃভাষার শিক্ষাটা শুধু সাংস্কৃতিক ব্যাপার না, এটা শিশুর একটা ব্যক্তি অধিকার, ব্যক্তিত্বের প্রসার ও উন্নতির একটা ব্যাপার আছে। এখানে অব্যশই সুশীল সমাজের ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর একটা মুখ্য ভূমিকা থাকতে হবে এবং সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছাও অবশ্যই থাকতে হবে। □

আয়োজক সংগঠনের পরিচিতি

হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরাম

ন্যায্যতা, শান্তি ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের অন্বেষায় নিরন্তর পদযাত্রা

পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের দ্বারা পরিচালিত স্থানীয় এনজিওগুলোর নেতৃবৃন্দ ১৯৯৯ সালে তাদের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে এবং তাদের কর্মদক্ষতাকে সুদৃঢ় করার মানসে হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরাম (এইচটিএনএফ) গঠন করেন। এটি এ অঞ্চলে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে জনকল্যাণমুখী ও পরিবেশমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম নিশ্চিতকরণে সহায়তা করে। এ অঞ্চল বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত আদিবাসী অধ্যুষিত একমাত্র অঞ্চল, যেটি তার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা, স্বকীয় ভূ-প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্যে দেশের অন্যান্য অঞ্চল হতে ভিন্ন। এ অঞ্চলের তিন পার্বত্য জেলা যথা- রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে বসবাসরত বিভিন্ন ভাষাভাষি এগারটি আদিবাসী পাহাড়ি জাতিসহ স্থায়ী বাঙালী অধিবাসীগণ সকল ক্ষেত্রে সুযোগ বঞ্চিত অবস্থায় রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। অতীতের সরকারগুলোর ভুল উন্নয়ন নীতি গ্রহণ এবং আড়াই দশক ধরে সংঘাতময় পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যথাযথভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে সর্বদা বঞ্চিত ছিল।

বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও এ অঞ্চলের মানুষের উন্নয়নমূলক কাজের সহায়ক পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। এ পরিবেশে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের উন্নয়ন সম্পর্কে যে নিজস্ব ধারণা আছে, তার যথাযথ মূল্যায়ন, স্থানীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যবস্থা ও সংস্কৃতিকে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দান, তথ্য সংগ্রহ, আদান-প্রদান ও প্রসারের ব্যবস্থা, সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার ভূমিকা পালনসহ সকল ক্ষেত্রে সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নতির লক্ষ্যে পার্বত্য অঞ্চল ভিত্তিক স্থানীয় উদ্যোগী ও অগ্রসর শ্রেণী সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবীর ভিত্তিতে এখানে গড়ে তুলে স্থানীয় উন্নয়ন সংগঠন। এসব উন্নয়ন সংগঠন এতদাঞ্চলে প্রকৃত ও অর্থবহ অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়ন সাধনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাদের এ জনমুখী ও পরিবেশমুখী উন্নয়ন সাধনের তাড়না থেকে প্রতিশ্রুতিশীল এসব স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থাসমুহ গঠন করে হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরাম।

জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক)

'শিল্প জীবনের জন্য' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পের ব্যাপক চর্চা, গবেষণা, প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৮১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী এই নান্দনিক সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে - গোড়াতেই যার নাম ছিল রাঙ্গামাটি ঈসথেটিকস কাউন্সিল (রাক)। পরে নাম পরিবর্তন করে জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক) করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ সংগঠন অনেক বাধা, প্রতিকুল ও বৈরী প্রাচীর ডিঙিয়ে অমসৃণ পথেই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এ সংগঠন প্রকাশনা, লিপি ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী, সেমিনার, শিশু চিত্রাংকণ প্রতিযোগিতা, আদিবাসী ধাঁধাঁর আসর, রচনা প্রতিযোগিতা, আদিবাসী কবিতা পাঠের আসর, আলোচনা সভা, গোল টেবিল বৈঠক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আদিবাসী চাকমা নাটক, পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এ সংগঠন এ পর্যন্ত ৩০টি প্রকাশনা বের করেছে। প্রকাশনাগুলো অনেক আদিবাসী জুম্ম

সাহিত্য রসিক, বোদ্ধা, লেখক, কবি, সমালোচক ও পাঠকদের নাড়া দিয়েছে, আন্দোলিত করেছে। এই সংগঠন ১৯৯৮ সাল থেকে আজ অবধি রাঙ্গামাটি ট্রাইবেল কালচারাল ইনষ্টিটিউট প্রাঙ্গণে ৮ বার পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা আয়োজন করেছে। এ আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ সংগঠন এ যাবৎ মোট ১৫টি নাটক মঞ্চস্থ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও ঢাকা ও চট্টগ্রামেও নাটক মঞ্চায়নও বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসছে।

Kapaeeng

An Indigenous Human Rights Organization of Bangladesh

'Kapaeeng' is a term derived from indigenous Khumi language, meaning 'Rights'. Kapaeeng is a human rights organization, which was established in 2003 with the view to working for promotion and protection of the rights of indigenous peoples of the country. As it knows that the indigenous peoples being the most vulnerable sect within the country are always neglected and victims of various human rights violations. They are deprived of basic rights guaranteed by the constitution of the State. So it is committed to help the victimized indigenous peoples by providing legal supports and other substantive assistances.

It is originally a Dhaka base organization. Some trainings and workshops have already been conducted by Kapaeeng jointly with some organizations. It has also observed some internationally recognized days including World Human Rights Day and International Mother Language Day. Kapaeeng is aiming at establishing a strong network and working closely with organizations and individuals working on indigenous peoples issues and rights in local, national and international levels.

CARE-Bangladesh

CARE Bangladesh is a part of CARE International, one of the world's largest private international humanitarian organizations, enabling families in poor communities to improve their lives and overcome poverty. CARE began work in Bangladesh in 1949 with the famous CARE packages that the Americans sent to survivors of World War II in Europe and Asia. Today, CARE is partnering with communities, community based organizations, the Government and national NGOs to identify and confront root causes of the poverty. CARE's programs focus on agriculture, education, health, water and sanitation, nutrition, infrastructure and small enterprise development, reaching around eight million people in 64 districts of Bangladesh.

CARE Bangladesh seeks a world of hope, tolerance and social justice, where poverty has been overcome and people live in dignity and security. CARE Bangladesh will be known everywhere for our unshakable commitment to the dignity of people.

The Education Programme of CARE Bangladesh has three main objectives: a) to improve access to basic education with special emphasis on girls' education; b) to improve quality and relevance of education and c) to enhance education system capacity and accountability to communities. To pursue these objectives, CARE Bangladesh

implements a project named CHOLEN in the Chittagong Hill Tracts (CHT). The project is sponsored by USAID and Basic Education Initiatives (BEI) grant of CARE-USA.

The strategy adopted by the project to address the key problems of education in the CHT is through formal government/non-government/community managed schools for Primary Education. The project facilitates a participatory process whereby indigenous communities can take ownership and management of the education process, and meet the educational needs of their children and communities. CHOLEN gives special emphasis on increasing girls' education and enhancing teaching-learning methodology in schools. As one of the means of promoting enhanced teaching-learning methodology, the project also encourages appropriate usage of indigenous languages in the classroom. CHOLEN works in partnership with local partner organizations and attempts to influence local government agencies to improve facilities in education system in CHT.